কাগজের মানুষেরা

মোনাজাতউদ্দিন

কাগজের মানুষেরা

মোনাজাতউদ্দিন

Centre for Advanced Media
(CAM)
Book No....51.......

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনার চার দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© নাসিমা মোনাজাত ইতি
প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ২৪৯৪৬৩

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
৫১/৫২ বনগ্রাম রোড, ঢাকা ১১০০

দাম
সত্তর টাকা মাত্র

I S B N 984-410-076-3

KAGOJER MANUSHERA : By Monajatuddin. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Samar Majumder. **Price : Tk. Seventy Only.**

www.pathagar.com

মোনাজাতের শেষ দেখা, শেষ লেখা

'কাগজের মানুষেরা'—বলতে গেলে এটিই মোনাজাতউদ্দিনের শেষ লেখা, অসমাপ্ত রচনা। রচনাটি শেষ করে যেতে পারেননি মোনাজাতউদ্দিন। মৃত্যু এসে তাঁকে নিয়ে গেছে তাঁর নিজস্ব ভুবন থেকে, আমাদের কাছ থেকে, অনন্ত আকাশের ঠিকানায়। তিনি লিখছিলেন, তাঁর অলখে মৃত্যু ওঁৎ পেতে ছিলো। পথ থেকে পথে ঘুরে বেড়ানো এই চারণ সাংবাদিক পথেই হারিয়ে গেলেন। তাঁর কলম স্তব্ধ হয়ে গেল চিরতরে!

'কাগজের মানুষেরা' বইটিতে মোনাজাতউদ্দিন সংবেদনশীল মন নিয়ে তাঁর সহকর্মীদের আঁকতে চেষ্টা করেছেন, যাঁদের প্রচেষ্টায় একটি পত্রিকা দিনের প্রথম সূর্যের মুখ দেখে। মোনাজাত তাঁর সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক ছিলেন, এ রচনা তাঁর সেই মমত্ববোধ থেকেই লেখা।

মোনাজাত তাঁর বই প্রকাশনার আগে নিজেই সবকিছু খুঁটে খুঁটে দেখেছেন, কেবল এ বইটি ব্যতিক্রম। স্বাভাবিক কারণেই এ বইয়ে কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। আমার অগ্রজ এ.জেড.এম নাসিমুজ্জামান এবং অনুজ প্রতীম আকবর হোসেন ও আশাফা সেলিম তাঁর হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি পাঠোপযোগী বিন্যাস করেছেন—এজন্যে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বইটি প্রকাশে বিশেষভাবে আমাকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য মাওলা ব্রাদার্সের কর্ণধার আহমেদ মাহমুদুল হককে ধন্যবাদ।

বছরাধিককাল পূর্বে যে মানুষটি গত হয়েছেন সেই মানুষের জীবনের শেষ মুহূর্তে লিখিত রচনাটি হাতে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে নষ্টালজিক হবেন অনেকেই, স্মৃতির পাতা উজ্জ্বল হবে, যেমনটি আমার হয়েছে। নববর্ষের দিনে সহকর্মীদের টেবিলে মোনাজাতউদ্দিন শুভেচ্ছা-রজনীগন্ধা রেখে আসতেন। সেই রজনীগন্ধার মাঝে বেঁচে থাকুন চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন। বেঁচে থাকুন তিনি গ্রাম বাংলায় তাঁর প্রিয় চারণভূমিতে।

ফেব্রুয়ারি '৯৭

নাসিমা মোনাজাত ইতি

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

পথ থেকে পথে
সংবাদ-নেপথ্যে
কানসোনার মুখ
পায়রাবন্ধের শেকড় সংবাদ
নিজস্ব রিপোর্ট
ছোট ছোট গল্প
চিলমারীর একযুগ
শাহাআলম ও মজিবরের কাহিনী
অনুসন্ধানী প্রতিবেদন
কাগজের মানুষেরা
নয় নারী
লক্ষ্মীটারী

www.pathagar.com

দূরে থেকে কাছে থেকে দেশ দুনিয়ার হরেক রকম বার্তা নিয়ে আপনার দোরগোড়ায় লুটিয়ে পড়ে খবরের কাগজ।

এটা জীবন-যাপনের এমনই একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে যে, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যতোই সম্প্রসারিত হোক না কেন বিবিসি, সিএনএন বা ডিশে দুনিয়া হোক নিকটবর্তী, কিন্তু পত্রিকা না হলে চলে না আপনার কোনমতেই। নাশতার টেবিলে কাগজ না এলে অস্বস্তি হয়, অফিসে গিয়ে যখন দেখেন কাগজ আসে নি তখন ছটফটানি লাগে। ঢাকার বাইরে যে পাঠক গোষ্ঠী তারাও উন্মুখ থাকেন, কখন বিমানে ট্রেনে বাসে এসে পৌছুবে পেপার। কোন কোন উন্নাসিক আছেন যারা বলেন, ধুত্তোরি আজকাল কাগজে আর তেমন কিছু পাওয়া যায় না, কিংবা বলেন আমি পেপার-টেপার পড়ি না। এরকম বাদে আর সবাই যারা সমাজের সচেতন অংশ, তাদের কাছে সংবাদপত্র খাদ্যবস্তু বাসস্থানের মতো মৌলিক প্রয়োজনের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংবাদপত্র খবর দেয় আপনাকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি এটি এখনো রয়ে গেছে অজ্ঞাত এক জগত হিসেবে। খুব ধারে কাছের মানুষ ছাড়া অনেকেই অবগত নন এর কাঠামো সম্পর্কে, জানেন না কি করে রোজ সকালে প্রকাশিত হয় একটি সংবাদপত্র।

মিডিয়ার এই জগতটি আজো অনেক পাঠকের কাছে রয়ে গেছে অজ্ঞাত। অনেকেই সঠিক জানেন না এই প্রতিষ্ঠানটির কাঠামো, কারা কোন পদে থেকে কিভাবে কাজ করেন। দেশের বিভিন্ন শহর গ্রাম সফরের সময় বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সাথে যে কথাবার্তা হয় সংবাদপত্র নিয়ে তাতে বুঝতে পারি তারা অনেকেই এ সম্পর্কিত তথ্যশূন্যতায় রয়েছেন। এমনকি গ্রামীণ পর্যায়ে কর্মরত কোন কোন সংবাদকর্মী, যারা নতুন এসেছেন এই পেশায়, তাদেরও অস্পষ্ট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে।

সংবাদপত্র এবং এর কাঠামো, সাংবাদিকতা, এসব বিষয়ে কয়েকটি বই রয়েছে। সেগুলো মূলত একাডেমিক লেখা। আমার এ বইটি একেবারে সাধারণ পাঠক এবং গ্রামীণ পর্যায়ে কর্মরত তরুণ সাংবাদিকদের জন্যে। খুব সহজ করে বলতে চেয়েছি একটি খবরের কাগজ প্রকাশের নেপথ্যে থাকে কতো মানুষের মেধা-শ্রম-ঘাম।

খবর দেয় খবরের কাগজ।

www.pathagar.com

কিন্তু শুধু কি খবরই দেয়? তা নয়। বিশ্বের কোথায় কি ঘটলো জানতে পারছেন, জানতে পারছেন রাষ্ট্রপরিচালকদের তৎপরতা, নেতা-নেত্রীদের বক্তৃতা, বিবৃতি, রাজনীতির হালচাল, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, দুর্নীতির কাহিনী, দুর্ঘটনা, খুনখারাবি, কারো মৃত্যু সংবাদ, দ্রব্যমূল্য, উন্নয়ন কি হচ্ছে না হচ্ছে, বিবিধ সমস্যা সংকট, সামাজিক সমস্যা, গাঁও গ্রামের খবর, পরীক্ষার দিনতারিখ, ফলাফল, নানান বিষয়ের ওপর ফিচার। কিন্তু এই সব খবর দিয়েই কেবল বেরোয় না একটি সংবাদপত্র, তাতে থাকে আরো নানানটা। থাকে সম্পাদকীয় মন্তব্য, এক বা একাধিক উপসম্পাদকীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিস্থিতির ওপর বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ, থাকে পাঠকের চিঠিপত্র, এছাড়াও একেকদিন পাচ্ছেন সাহিত্য সাময়িকী, অর্থনীতির পাতা, খেলাধুলার পাতা, ছোটদের আসর, মেয়েদের পাতা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়ক লেখার পাতা। থাকছে বিবিধ পণ্যের বিজ্ঞাপন, টেণ্ডার নোটিশ, কর্মখালি, পাত্রপাত্রী চাই, জমি বাড়ী বিক্রি, বাড়ী ভাড়া, পড়াতে চাই, এরকম শতেক। কোন সিনেমা হলে কোন ছবি মুক্তি পেলো, নতুন বই কি বেরুলো, লটারির ফলাফল, সোনারূপার বাজার দর, শেয়ার বাজারের অবস্থা, এরকম নানা বিষয় পেয়ে যাচ্ছেন সম্মুখে, সাজানো-গোছানো কয়েকটি পাতায়।

কিছুদিন হলো বেশকিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে সংবাদপত্রে, তাতে থাকছে শিক্ষার্থীদের আসর, বই নোট বই পর্যন্ত ছাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। আইন বিষয়ক পরামর্শ, ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন, কৃষি বার্তা, সেই আদ্দিকালের খনার বচন পর্যন্ত পেয়ে যাচ্ছেন। থাকছে ছবি, কার্টুন। আজকাল কয়েকটি পত্রিকা অনেক খরচের ঝুঁকি নিয়েও রঙিন ছবি ছাপানোর দিকে ঝুঁকেছে। সাহিত্য সাময়িকী কিংবা ফিচার পাতার অংগসজ্জায় যেমন নতুনত্ব এসেছে তেমনি আবার করা হচ্ছে রঙচঙে। ব্যবসায়িক স্বার্থ, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা, পাঠক আকৃষ্ট করা কিংবা থাকুক অঢেল অর্থের জোর, নিউজপ্রিন্টের দারুণ সংকটের দিনেও কোন কোন পত্রিকা প্রতিদিন বের করছে ষোল থেকে বিশ পৃষ্ঠার কাগজ। আরো বেশি করে পাঠক আকৃষ্ট তথা প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে পত্রিকার মালিক-প্রকাশকের প্রচেষ্টার অন্ত নেই।

মডেম প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের একাধিক স্থান থেকে কাগজ বের করছে জনকণ্ঠ, আরো দুয়েকটি পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সেই চেষ্টায় আছে। কেউ বা পৃষ্ঠা বেশি দিচ্ছেন, কেউ রঙ দিচ্ছেন, কেউ পরিবেশন করছেন নতুন নতুন বিষয়। পত্রিকার বিপণন ব্যবস্থা আগে যেটা ছিল, তা ক্রমশ ভেঙ্গে যাচ্ছে। প্রয়োজনের স্বার্থে ভেঙ্গে পড়ছে পুরাতন কাঠামো। বিভিন্ন বিভাগে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন পদ। যেমন ধরুন পত্রিকার ফটো সেকশনের কথা।

আগে এই কিছুদিন আগেও ফটো এডিটর বলে কেউ ছিলেন না। ছিলেন ফটোগ্রাফার, তারা সংখ্যায় একাধিক হলে একজন হতেন চীফ ফটোগ্রাফার। এঁরা ছবি তুলতেন, নিজেরাই তা প্রসেস করতেন, এগিয়ে দিতেন নিউজ এডিটরের টেবিলে। একাধিক পত্রিকায় এখন নিয়োজিত হয়েছেন ফটো এডিটর। ফটোগ্রাফাররা ছবি তুলে এনে দিলে বাছাই করেন তিনি। প্রয়োজনীয় কাটছাঁট সম্পাদনা করেন। কয়েকটি

www.pathagar.com

পত্রিকায় ডার্করুমের জন্যে আলাদা কর্মী এসেছেন। ছবি প্রসেস করেন তারাই। এটাও নতুন পদ। রিপোর্টিং সেকশনে আগে এমন ব্যাপার ছিল যে, একই রিপোর্টার অর্থনীতির ওপর লিখতেন, কখনো অন্যান্য বিষয়ে। এখন আলাদা আলাদাভাবে (স্পেশালাইজড) রিপোর্টিং হচ্ছে। গড়ে উঠেছে খেলাধুলার খবরের জন্যে আলাদা ডেস্ক, ফিচার পাতা সম্পাদনার জন্যে নিয়োজিত হয়েছেন ফিচার এডিটর।

কাঠামোগত পরিবর্তনটা কেমন হয়েছে, পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্যে বলি : পত্রিকা প্রকাশনার শুরুর দিকে কাগজের জন্যে আলাদা কোন ফটোগ্রাফার ছিল না, কোন স্টুডিও থেকে লোক ধরে নিয়ে গিয়ে ছবি তোলা হতো, কিংবা সৌখিন কোন ফটোগ্রাফার ছবি নিয়ে আসতেন। বাইরের স্টুডিওতে প্রসেস হতো সে ছবি। তারপর ব্লক তৈরি হতো, ছাপা হতো।

তিন দশক আগেও এ অবস্থা ছিল কোন কোন পত্রিকায়। আজকের দিনে ব্যাপারটি অকল্পনীয়। একেকটি পত্রিকায় একাধিক ফটোগ্রাফার নিয়োজিত হয়েছেন, আছেন চীফ ফটোগ্রাফার, ফটো এডিটর। রঙিন ছবির জন্যে পত্রিকার নিজস্ব প্রসেসিং প্লান্টও গড়ে উঠেছে একাধিক পত্রিকায়। বিভিন্ন পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত হওয়ায় সংবাদপত্র শিল্প বিকাশ লাভ করছে দ্রুত।

সাংবাদিক কর্মচারীদের বেতনভাতা বেড়েছে। তাদের জীবনযাত্রা বদলে গেছে কিংবা যাচ্ছে। পেশা পরিচয়গত কাঠামো-পর্যায়গুলোতে পরিবর্তন ঘটেছে কোন কোন ক্ষেত্রে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বেড়েছে। আরো বেড়েছে পত্রিকার সংখ্যা। একাত্তর সালে এদেশে দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল দশটি, আশি সালের দিকে এই সংখ্যা দাঁড়ায় তেতাল্লিশটি। পঁচানব্বইতে এসে তা হয়েছে কতো?

অবশ্য এর মধ্যে এমন কতোগুলো আছে প্রকাশনা অনিয়মিত, কিংবা প্রচার সংখ্যা একেবারেই কম। বিজ্ঞাপন পেলে পরে তিন চারদিন অন্তর কিংবা সপ্তাহে একবার একটা সংখ্যা ছাপিয়ে দেয়া হয়। কোন পত্রিকা ডিক্লারেশনের পদ্ধতিগত ব্যাপারটি বজায় রাখবার জন্যে তিন মাস পর একটি করে সংখ্যা ছাপায়।

নিয়ম রয়েছে কোন দৈনিক একটানা তিনমাস না বেরুলে ডিক্লারেশন বাতিল হয়ে যাবে। সেকারণেই এমনটি করা হয়ে থাকে।

মজার ব্যাপার যে, এরকম বহু পত্রিকা রয়েছে যার প্রকৃত প্রচারসংখ্যা একরকম আর সরকারের অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশনে (এবিসি) দেখানো হয় অন্যরকম। এবিসিতে বেশি প্রচার সংখ্যা দেখালে বিজ্ঞাপন বেশি মেলে, নিউজপ্রিন্টের ভাগ বেশি পাওয়া যায়।

কিছু পত্রিকা আছে সত্যি বলতে কি তারা পত্রিকা প্রকাশের নামে নিউজপ্রিন্টের ব্যবসা করে থাকে। কাগজের কোটার কাগজখানা খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলেই বেচে দেয়া হয়। কেউ কাগজের রোল ঢাকায় নিয়ে এসেও বেচে দেন। বলাবাহুল্য এতে থাকে মোটা মুনাফা। সরকারি বিজ্ঞাপনের বিলিবন্টন প্রথাতেও যেমন আছে দুর্নীতি আর অনিয়ম, তেমনি আবার একশ্রেণীর পত্রিকা আছে যারা ঐ সরকারি বিজ্ঞাপনকে পুঁজি করে সংবাদপত্রের ব্যবসা করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

এমন উপমার অভাব নেই যে, পত্রিকাটি বের হচ্ছে পাঁচশ কি হাজার কপি, এগুলো এজেন্টের কাছে পাবেন না, কোন হকারের কাছে পাবেন না, পত্রিকার স্টলেও চোখে পড়বে না। পিওন ঘুপঘাপ এগুলো বিলি করে আসে বাছাইকরা সরকারি বেসরকারি কিছু দপ্তরে। তাছাড়াও, যাদের বিজ্ঞাপন ছাপা হয় তাদের কাছে কপি যায়, ডিএফপিতে কপি যায়, পিআইডি-তে কপি যায়।

সব সময় ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে, বলা হয়েছে প্রচারসংখ্যার ভিত্তিতে সরকারি বিজ্ঞাপন বণ্টন করা হবে। অনেক পাঠকেরও এরকম একটা ধারণা রয়েছে যে এই নিয়মনীতি মেনে চলা হচ্ছে। কিন্তু আদৌ তা নয়। সরকারি বিজ্ঞাপন বণ্টনে বৈষম্য তো হচ্ছেই এমনকি রাজনৈতিক রোষের কারণে একাধিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া বন্ধ রয়েছে। সরকারের গীত গায় এরকম পত্রিকা দৈনিক বিজ্ঞাপন পাচ্ছে দুই পৃষ্ঠারও বেশি, অথচ পুরোপুরিভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে 'সরকারের পছন্দ নয় এমন কথা লেখে' এরকম কিছু পত্রিকাকে।

প্রায় সব সরকারের শাসনামলেই বিজ্ঞাপন বণ্টনে ব্যাপক দুর্নীতি আর অনিয়ম হয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও তেমনটি হচ্ছে। বহু দাবি উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপন বিলিবণ্টনে সুষ্ঠু কোন নীতিমালা এখনও গড়ে ওঠে নি। এটি এখনো হয়ে আছে সংবাদপত্র দলনের হাতিয়ার হিসেবে।

ব্যাপক অনিয়ম হচ্ছে নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দ নিয়েও। কাগজ আদৌ বের হয় না এমন পত্রিকা নিয়মিত পাচ্ছে নিউজপ্রিন্টের কোটা, তারা সেগুলো বেচে দিচ্ছে, মোটা মুনাফা গুণছে। আর অন্যদিকে, জনপ্রিয় পত্রিকা, নিয়মিত প্রকাশিত হয়, সার্কুলেশনও ভালো, এরকম অনেক পত্রিকা নিউজপ্রিন্ট সংকটের কারণে পৃষ্ঠা সংখ্যা কমিয়ে এনেছে, কিংবা কেউ বের করছে প্রকৃত প্রচার সংখ্যার অনেক কম।

এ পরিস্থিতি আছে পঁচানব্বই সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে এই পাণ্ডুলিপি তৈরির সময়। বইটি বের হবার পর নিউজপ্রিন্ট সংকট থাকবে কিনা জানি না, তবে এরকম একটি সংকটের কথা মনে থাকবে পত্রিকার মালিক সম্পাদক প্রকাশক গোষ্ঠীর, মনে থাকবে সাংবাদিক ও পাঠকদের।

সংবাদপত্রের কাঠামোটি বিরাট। এই শিল্পের সাথে যারা জড়িত, সম্পাদক থেকে শুরু করে আপনার দোরগোড়ায় হাজির হওয়া হকার, এদের প্রত্যেকের শ্রমের ফসল হয়ে আপনার হাত পর্যন্ত পৌছায় একটি পত্রিকা। সাধারণভাবে এমন হালকা ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকে যে সাংবাদিকরা বের করেন একটি খবরের কাগজ। এমন বলা হয়ে থাকে : সবাই যখন মধ্যরাতের ঘুমে, সাংবাদিক তখন লিখে যাচ্ছেন দেশ দুনিয়ার খবর। ব্যাপারটি পুরোপুরি সত্য নয়। ঐ সময়টি, যদি মধ্যরাতই ধরি, জেগে থাকতে হয় আরো কয়েকটি পদের কর্মীকে। জেগে থাকতে হয় প্লেট মেকার, মেশিনম্যান, বাইণ্ডার, ডেসপ্যাচার এমনি আরো অনেককে। এদের একজন কাজে না থাকলে পত্রিকা ছাপানো থেকে বাজারজাতকরণ পুরো প্রক্রিয়াটাই হয়ে পড়বে ব্যাহত।

আসলে, একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারটি এমন একটি টীমওয়ার্ক যাতে গোটা শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন স্তরের কর্মীকে সময় ও প্রক্রিয়াগতভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করে যেতে হয়। এখানে একজনের কর্তব্য গাফলতি ফাঁকি কিংবা অনুপস্থিতি বরবাদ করে দিতে পারে সম্পাদনা প্রকাশনা থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণের ব্যাপারটি।

কল্পনা করুন যে বহুজনের দিনরাত কাজের ফসল হিসেবে ভোরবেলা ছাপা হয়ে বেরুলো কয়েক হাজার খবরের কাগজ। কিন্তু, ছাপাখানা বাইণ্ডাররা হাজির নেই কেউ। কি দাঁড়াবে অবস্থাটা? নিশ্চিতই মেইল ফেল করবে। প্রচুর টাকার ক্ষতি পোহাতে হবে পত্রিকার মালিককে। আর, ঢাকা শহরের গাদা গাদা কাগজগুলো অবিক্রিতই পড়ে থাকবে যদি কোন কারণে বেঁকে থাকে হকার্স সমিতি কিংবা বিভিন্ন পর্যায়ের হকারের দল। আপনার বাসা অফিস কিংবা দোকানে কাগজ পৌছাবে কে? সেক্ষেত্রে মালিকের অর্থ আর সাংবাদিক কর্মচারীর মেধাশ্রম ব্যয় করে প্রকাশিত একটি পত্রিকা, ছাপার অক্ষরে ঠিকঠাক বেরিয়ে এলেও পাঠকের হাত পর্যন্ত তা যাবে না।

আসলে পত্রিকা একটি প্রকাশনা শিল্পপণ্য যার উৎপাদন ও পরবর্তী পর্যায়ে বিপণন ব্যবস্থার পেছনে কেবল সাংবাদিকরা নন, জড়িত রয়েছেন আরো বহু মানুষ।

পত্রিকার প্রিন্টার্স লাইনে সম্পাদক প্রকাশকের নাম ছাপা হয়, কোন একটা স্টোরি সাংবাদিকের নামে ছাপা হয়, উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ নামে ছাপা হয়, সে কারণে পাঠক সাধারণত এদেরই জানেন, কিন্তু অজ্ঞাত থেকে যায় আরো বহু মানুষের কর্ম প্রক্রিয়া।

পাঠক জানেন না কে বা কারা দেশ বিদেশের খবরগুলো সম্পাদনা করছেন, কারা লিখছেন সম্পাদকীয়, পাঠকের চিঠিপত্রগুলো কে কাটছাট করে ছাপতে দিচ্ছেন। একইভাবে, রীডার কম্পিউটার অপারেটর থেকে শুরু করে একজন পিওন; সার্কুলেশন এডভারটাইজমেন্ট একাউন্টস প্রেস সেকশনের কয়েক'শ কর্তা কর্মী থেকে যান পাঠকের জানার বাইরে।

একটি সংবাদপত্রের সর্বোচ্চ পদের মানুষটি হলেন সম্পাদক। তিনি সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং সম্মানিত। সারা বিশ্বে এই পদটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। রোজকার কাগজে প্রিন্টার্স লাইনে এর নাম দেখেন পাঠকেরা। কিন্তু একটি পত্রিকা প্রকাশের জন্যে কাড়ি কাড়ি অর্থ যোগান দেন যিনি, মালিক সংখ্যায় এক বা একাধিক হতে পারেন, তারা কিন্তু পাঠক সমাজে অতোটা আলোচিত নন। সমাজে যারা আর দশজনের খবর রাখেন, তারা ছাড়া, অধিকাংশ পাঠকের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায় যে মূলত কার বা কাদের টাকায় পত্রিকাটি ছাপা হচ্ছে। একটি পত্রিকা প্রকাশের পুঁজি একটা বড় ব্যাপার, বলতে গেলে প্রধান গণ্য ব্যাপার, কিন্তু সেটি থাকে আড়ালে।

এমন একটা সময় ছিল যখন পত্রিকা প্রকাশ করা হতো রাজনৈতিক কারণে, দেশ-সমাজের সেবা করবার জন্যে। সাংবাদিকতা তখন ছিল একটা মিশন। এখন সে যুগ হয়েছে বাসি। এদেশে ব্যবসায়িক লাভের ব্যাপারটিকে প্রধান হিসেবে নিয়ে একের পর এক পত্রিকা বেরুচ্ছে। প্রচার সর্বস্ব পত্রিকা বেরুচ্ছে রাজনৈতিক দলের বা দল জড়িত কোন ব্যক্তির টাকায়। এমন পত্রিকাও রয়েছে যারা নিজ দলের মতবাদ বেশি করে প্রচার করে, প্রকাশনার টাকা আসে ভূতের বাড়ী থেকে।

তবে, সেসব বাদ দিলে অধিকাংশ পত্রিকারই অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে (বা হচ্ছে) ব্যবসায়ী পক্ষ থেকে। এঁরা অন্য কোন শিল্পকারখানার মালিক, সেখান থেকে টাকা

www.pathagar.com

দিয়েছেন, কেউ ব্যাংক ঋণ নিয়েছেন, কেউ করেছেন ধারদেনা। লাভের লক্ষ্য সবার সামনে থাকে, কেননা, এমনতো নয় যে পুঁজি খাটাবেন কিন্তু মুনাফার কথা ভাববেন না। হ্যাঁ, কেউ মুনাফা করেন, পাহাড় প্রমাণ মুনাফা, আবার কেউ লোকসানও গোনেন, কেউ বা লাভে-লোকসানে সমান সমান। লোকসানের কারণ দেখিয়ে কোন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে আবার কোন পত্রিকা মুনাফায় মুনাফায় এমনই অবস্থা হয়েছে যে সংবাদপত্রের লাভের টাকায় নিজেদের বিলাস ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনই গড়েন নি, ছোট হোক বড় হোক আরো কিছু শিল্প কারখানাও গড়েছেন।

এমনও মালিক আছেন, অর্থ কিছু গচ্চা দিলেও সংবাদপত্রটিকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সামনের শুভ দিনের আশায়। কেউবা পত্রিকা চালাচ্ছেন সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিটুকু ধরে রাখবার জন্যে। বহুবছর ধরে পত্রিকাটা বেরুচ্ছে, এখন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো . . .। তবে হ্যাঁ, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন সুবিধা হাসিল ছাড়াও, বিশেষ মতবাদ প্রচার করেও ভালো মুনাফা নিয়েই বেরুচ্ছে কোন কোন পত্রিকা।

কোন পত্রিকার মালিক একজন, কোন পত্রিকায় একাধিক। এঁদের আছে পরিচালনা বোর্ড। কোন পত্রিকা আবার ট্রাস্টের হাতে। যেমন 'দৈনিক বাংলা' ট্রাস্ট মালিকানাধীন একটি পত্রিকা। সাধারণভাবে 'সরকারি পত্রিকা' বলা হয়ে থাকে। বহুবছর বন্ধ থাকার পর এখন আবারো রাজশাহী থেকে বেরুচ্ছে 'দৈনিক বার্তা'। এ পত্রিকাটিও 'সরকারি কাগজ' বলে পরিচিত। ঢাকার বাইরে অর্থাৎ চট্টগ্রাম খুলনা বগুড়া দিনাজপুর রংপুর কুমিল্লা যশোর কুষ্টিয়া ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন জেলাশহর থেকে যে দৈনিক সংবাদপত্র বেরুচ্ছে, সেগুলোর প্রতিটিই ব্যক্তি-মালিকানাধীন। এঁদেরও পুঁজি এসেছে নানাভাবে। ঢাকা আর ঢাকার বাইরের মালিকানার মধ্যে পার্থক্য এটুকু যে ঢাকার কিছু পত্রিকা মালিক প্রিন্টার্স লাইনে আছেন সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে, কিছু পত্রিকার মালিকই সরাসরি সম্পাদক। কেউবা একটি লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বগুড়া দিনাজপুর রংপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিকগুলোতে মালিকই সম্পাদক, সেখানে লিমিটেড কোম্পানীর নামও দেখা যায় না।

রাষ্ট্রের চারটি স্তম্ভের অন্যতম একটি হলো সংবাদপত্র। এজন্যে একে 'ফোর্থ এস্টেট' বলা হয়ে থাকে। প্রটোকল অনুযায়ী একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকের স্থান দেশের রাষ্ট্রপতির সাথে তুলনীয়। সংবাদপত্র জগতের মানুষজন শুধু নয়, সরকার বা প্রশাসনও একজন সম্পাদককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

আগেই বলেছি মালিক অর্থ জোগান দিলেও সংবাদপত্রে সর্বোচ্চ পদের নাম সম্পাদক, খবরের কাগজের জগতে তিনিই সবচাইতে প্রভাবশালী, সম্মানিত একটি পদের মানুষ। অতীত দিনে দেখা গেছে মওলানা আকরম খাঁ, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবুল কালাম সামসুদ্দিন, আব্দুস সালাম, জহুর হোসেন চৌধুরী, মাহবুবুল হক এঁরা ছিলেন বিরাট সম্পাদক ব্যক্তিত্ব, স্বনামে বেনামে কলামও লিখতেন তাঁরা। লিখতেন হলিডে সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খান। আজাদ, ইত্তেফাক, সংবাদ, অবজারভারসহ বিভিন্ন পত্রিকা প্রধানত সম্পাদক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

www.pathagar.com

বৃটিশ আমলে উপমহাদেশের কিছু সংবাদপত্র যে লড়াই করেছিল, তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সম্পাদকরাই। পাকিস্তান আমলের সামরিক শাসন, একনায়কতন্ত্র, পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেও স্বৈরাচার হটানো এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে পত্রিকা ও তার সম্পাদকরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের লেখনীর মাধ্যমে কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনে জড়িত থেকে।

বয়সীরা অনেকে জানেন কিন্তু নতুন প্রজন্মের কাছে সম্পাদকদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস অজ্ঞাত রয়ে গেছে। সংবাদ সম্পাদক আহমদুল কবির কয়েকবছর আগেও স্বনামে কিছু লিখেছেন, এখন লেখেন না, তবে দেশের সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি এখনো সোচ্চার, গণতান্ত্রিক পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি তিনি, পার্লামেন্টে থাকার সময়ে একজন ক্ষুদে পার্লামেন্টারিয়ন হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

বিতর্কিত বিষয় নিয়ে হলেও ইত্তেফাকে ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন এখনো স্বনামে লিখছেন। তিনি জিয়াউর রহমান শাসনামলে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ছিলেন। প্রিন্টার্স লাইনে দেখা যায় তিনি ইত্তেফাকের সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি। এই পত্রিকার সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। তিনি এরশাদ আমলে মন্ত্রী ছিলেন, এখনো জাতীয় পার্টির নেতা।

দৈনিক বাংলার সম্পাদক আহমেদ হুমায়ূন একসময় সাংবাদিকদের রুটিরুজির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, এখনো মাঝে মধ্যে কিছু লেখেন, তাঁর আলেফ মিয়ার কাহিনী সিরিজটি এদেশের সাধারণ মানুষের সমগ্র বঞ্চনার কাহিনী যা পাঠকদের উচ্চ সমাদর পেয়েছে।

সাপ্তাহিক একতার সম্পাদক ছিলেন রাজনৈতিক বোদ্ধা মতিউর রহমান, কিছুদিন দৈনিক সংবাদের জন্যে বিশেষ প্রতিবেদন লেখেন, এখন ভোরের কাগজের সম্পাদক, নিবন্ধ রচনা ছাড়াও সম্পাদক থাকা অবস্থায় তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার-রিপোর্ট লিখেছেন।

ইত্তেফাকের কূটনৈতিক রিপোর্টার মতিউর রহমান চৌধুরী, একসময় দৈনিক সংবাদেও নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ছিলেন। তিনি বাংলাবাজার পত্রিকা প্রকাশ করেন নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত পুঁজি বিনিয়োগে। পত্রিকাটির মালিকানা বদল হলেও মতিউর রহমান চৌধুরী এখনো তার সম্পাদক। নিয়মিত লিখছেন, যেগুলো রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রাইসিস নিয়ে লেখা হলেও প্রথম পাতায় প্রধান শিরোনাম প্রতিবেদন হিসেবে ছাপা হচ্ছে।

অতীতে, এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের নেই যে, একটি পত্রিকার সম্পাদক প্রতিবেদন রচনা করেন। তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আব্দুস সালাম, জহুর হোসেন চৌধুরীর যুগে সম্পাদক হিসেবে তারা আগুনজ্বলা সম্পাদকীয় বা উপসম্পাদকীয় লিখতেন। এগুলোর কোনটা বিশেষ সম্পাদকীয় হিসেবে পত্রিকার প্রথম পাতাতে প্রকাশিত হতো। কিন্তু, দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে, এখন দেখা যাচ্ছে ভোরের কাগজ ও বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় পুরাতন ধারাটি ভেঙে দিয়েছেন। আজকের কাগজের

www.pathagar.com

সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমদ। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, একজন সামরিক কর্মকর্তা, এখন সম্পাদকদের সংগঠন বিএসপির একটি অংশের প্রধান, সামাজিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত, তার স্বনামে লেখা উপসম্পাদকীয় ছাড়াও বিশেষ সম্পাদকীয় লিখছেন যা ছাপা হচ্ছে আজকের কাগজের প্রথম পাতায়।

জনকণ্ঠের সম্পাদক আতিকুল্লাহ খান মাসুদ স্বনামে মাঝে মধ্যে লিখছেন সম্পাদকীয় পাতায়।

জনতার সম্পাদক মুহঃ আসাদুল হকও লিখতেন স্বনামে, চুরানব্বইতে, এখন আর চোখে পড়ে না।

খবর সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজানও একসময় লিখতেন, এখন দেখা যাচ্ছে না।

'বাংলার বাণীর' সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম সেলিম, একজন সংসদ সদস্য। তিনি নিজে লেখেন না, তবে সম্পাদকীয় লেখার বিষয় নির্বাচন করে দেন প্রায়শই, কোন বিশেষ বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন লেখান কোন রিপোর্টারকে ডিক্টেশন দিয়ে, সেগুলো 'বাংলার বাণী রিপোর্ট' হিসেবে ছাপা হয়।

দৈনিক দিনকালের সম্পাদক সানাউল্লাহ নূরী, আগে জনতার সম্পাদক ছিলেন। তিনি এখনো স্বনামে লিখে থাকেন।

সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে বিচিত্রার সম্পাদক শাহাদৎ চৌধুরী সাধারণ সংখ্যায় নয়, বিশেষ সংখ্যায় লেখেন। যায় যায় দিন সম্পাদক শফিক রেহমান, নতুন ধারার একটি পত্রিকা যেমন পাঠকদের দিয়েছেন তেমনি প্রতি সংখ্যায় লিখছেন খুব পাঠকপ্রিয় লেখা 'দিনের পর দিন' যার কিছু অংশ নিয়ে বইও বেরিয়েছে।

সম্পাদকদের রচনাগুলো সংকলিত করে বইয়ের সংখ্যা এদেশে খুব কম। খ্যাতিমান সাংবাদিক (মরহুম) জহুর হোসেন চৌধুরী, 'সংবাদ'-এ লিখতেন দরবার-ই-জহুর, সেগুলোর বাছাই করা কিছু নিয়ে 'লালন প্রকাশনী' বের করে একটি বই। আহমেদ হুমায়ুনের বই আছে একটি। আলেফ মিয়াকে নিয়ে রচিত লেখার সংকলন।

এছাড়া অবশ্য অনেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, অস্থায়ী সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, কলামিস্ট এবং কয়েকজন সাংবাদিকের বই রয়েছে। এগুলো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থার ওপর লেখা। কেউ গল্প, উপন্যাস, কবিতা লিখেছেন, কেউ বা স্মৃতিকথা লিখেছেন।

এটা ঠিক যে, সম্পাদকদের লিখিত কিংবা প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা এদেশে খুবই কম। হাতে গোনা।

আসলে, এর বাস্তব কারণটি হলো একজন সম্পাদক, তিনি যদি আবার মালিকও হন, তাঁকে পুঁজি আর লাভ-ক্ষতির ব্যাপারটি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়, তাকে আর সব শিল্পের (যদি থাকে) দেখাশোনা করতে হয়, রাজনৈতিক বা সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, এদিকে আবার নিজ পত্রিকাটি প্রকাশনার ব্যাপারে থাকতে হয় নানান টেনশনে। এ অবস্থায় লেখালেখি হয়ে ওঠে কষ্টসাধ্য।

সম্পাদককে সকালে এসেই পালাক্রমে সহকারী সম্পাদকদের সাথে মিটিং করতে হয় কাল পরশুর কাগজে কি কি সম্পাদকীয় বা আর সব লেখা থাকবে। রিপোর্টারদের

www.pathagar.com

সাথেও মিটিং করেন কোন কোন সম্পাদক। নিউজ প্রিন্টের কোটা তোলার মতো টাকা আছে কিনা, মাস পেরুলে সাংবাদিক কর্মচারীদের বেতন দেয়া যাবে কিনা এসব তত্ত্বাবধায়ন করতে হয় কোন কোন সম্পাদককে।

এছাড়াও নিজের পড়াশোনা আছে, অন্তত পড়তে হয় দেশী বিদেশী প্রধান প্রধান পত্রিকা, নিজের পত্রিকা খুঁটিয়ে না দেখলে ভুলভ্রান্তিগুলো ধরা যায় না। জনসংযোগ আছে, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যেতে হয়, আছে ব্যক্তিগত জীবন।

আজকাল আবার কোন কোন সম্পাদকের বিরুদ্ধে ঢাকায় বা ঢাকার বাইরে একের পর এক দায়ের হচ্ছে মামলা, সেজন্যেও ছুটোছুটি করতে করতে সময় কম খরচ হয় না।

একটি আদর্শ পরিস্থিতি হলো, সংবাদপত্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে একজন সম্পাদক রাষ্ট্রপতির মর্যাদা পাবার কথা। কিন্তু এদেশে সেই অবস্থা থেকে সম্পাদকদের অনেকদূরে অবস্থান করতে হচ্ছে।

এরশাদ আমলে জহুর হোসেন চৌধুরীকে যেমন ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তেমনি গণতান্ত্রিক সরকার বহাল থাকা অবস্থাতেও জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমেদ, বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই স্মরণে আছে পাঠকদের। এতে সম্পাদকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় নি, বরং ধিকৃত হয়েছে সরকারই।

কোন কোন সম্পাদক, জাতীয় দৈনিকের এমনকি ঢাকার বাইরে থেকে প্রকাশিত আঞ্চলিক বা স্থানীয় দৈনিকের সম্পাদক প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিদেশ সফরে গেছেন, যাচ্ছেন, কেউ কেউ সুবিধাও পেয়েছেন, মওলানা ভাসানীর 'হক কথা' পত্রিকায় চালু 'কদমবুচি সম্পাদক'-ও এখনো আছেন, আছে তাদের নিয়ে নানা কথাবার্তা, তা সত্ত্বেও বলবো একটি পত্রিকার সম্পাদকের মর্যাদা পাঠকের অন্তরে রয়েছে।

কেউ কেউ আছেন 'ইনস্টিটিউশন' হিসেবে। কিছু পত্রিকায় অন্যান্য শিল্পের মতোই অনিয়ম প্রবেশ করেছে, রয়েছে পরিচালনাগত জটিলতা, মালিকানার দ্বন্দ্ব; কোন কোন ক্ষেত্রে খর্ব হয়েছে সংবাদপত্রের অবজেকটিভ ভূমিকা, সম্পাদক হিসেবে সীমাবদ্ধ রয়েছেন কেবল প্রিন্টার্স লাইনে, সম্পাদকদের সংগঠনের বিভক্তি রয়েছে, এই পরিস্থিতির মাঝেও কয়েকজন সম্পাদক নিজেদের পদ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার চেষ্টা করছেন, এখনো তারা অপবিত্র হন নি। সংখ্যায় এরা কম, কিন্তু আজো এরকম নীতির মধ্যে রয়েছেন যে, তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটি যেনো সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থাকে, অশ্লীল কিছু প্রকাশিত না হয়, পাঠকের কাছে পত্রিকার বিশ্বাসযোগ্যতা যেনো টিকে থাকে।

সবগুলো পত্রিকারই নিজস্ব পলিসি রয়েছে, রয়েছে সংবাদ বা সম্পাদকীয় মন্তব্য পরিবেশনার নিজস্ব স্টাইল, কেউ সাধুভাষায় লিখছেন কেউ চলতি ভাষায়, কেউ পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশি দিচ্ছেন কেউ কম, কেউ ছবিতে কালার ইন্ট্রিডিউস করেছেন কেউ থেকে গেছেন এক রঙাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিবেক রুচি বর্জন করেন নি তাঁরা। সামনে এমন দিন আসবে যখন এঁদের দলটিই হয়ে যাবে সংখ্যা ও প্রভাবে ভারী।

নীতির ধার না ধেরে কোন এক সম্পাদক ক্যাঙ্গারু লাফে কাগজ বদলিয়ে ফেললেন রাজনৈতিক দল বদলের মতো, তোয়াজ করে সম্পত্তি গড়লেন, আখের গুছালেন, এসব

www.pathagar.com

যেমন অস্বীকার করা যাবে না, তেমনি আবার এটাও ঠিক যে কিছু সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের কারণে বেশ কিছু দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক এখনো মূল্যবান, জনপ্রিয়। অভ্যন্তরীণ শতেক সমস্যা সংকট সত্ত্বেও এগুলো টিকে আছে, সবচেয়ে বড়ো কথা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই টিকে আছে।

এটা ঠিক যে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আব্দুস সালাম, জহুর হোসেন চৌধুরী, এঁরা যে সময়ে বা যেভাবে কাজ করে গেছেন, সমাজ বিবর্তনের ধারায় তেমন পরিবেশ-পরিস্থিতি আজ আর নেই, নেই সেই অগ্নিঝরা লেখা, কলমের লড়াই, নেই সেই মিশনারি জিল; সেটি আর হয়তো ফিরেও আসবে না, কিন্তু এমন আশা নিশ্চয়ই পোষণ করা যেতে পারে যে, সামনের দিনে সম্পাদকীয় স্তম্ভ গড়ে উঠবে সম্পূর্ণ নতুন একরকম হয়ে। আজকে যারা সম্পাদক তাদের মধ্যে সুস্থ, সুন্দর, রুচিবান, বিবেকবান, সমাজযোদ্ধা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্নরা কেউ কেউ পাঠকের অন্তরে আসন গেড়েই থাকবেন।

লেখালেখির কাজে একজন সম্পাদক সময় দিতে পারেন কম। আগে তা বলা হয়েছে। তথ্যশূন্যতায় থাকা অনেক পাঠকের ধারণা আছে যে, তিন চার বা পাঁচের পাতায় যে সম্পাদকীয় ছাপা হয়, সেগুলো বুঝি লেখেন সম্পাদক সাহেবই। আসলে তা নয়। সম্পাদকীয় লেখার জন্যে আছেন একাধিক সহকারী সম্পাদক। বিভিন্ন পত্রিকায় উপদেষ্টা সম্পাদক, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, অস্থায়ী সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, এরকম আছেন। এদের দায়িত্ব একেকরকম।

যেমন ধরুন 'সংবাদ' এর কথা। এর সম্পাদক আহমদুল কবির, পরিচিতি আগেই বলেছি। তিনি ৭২ বছর বয়সেও কর্মতৎপর, নিয়মিত তাঁর আসনে বসেন, প্রায়শই মিটিং করেন সম্পাদকীয় লেখার বিষয় নিয়ে। রিপোর্টার্স মিটিংয়েও উপস্থিত থাকেন তিনি, দেন দিকনির্দেশনা, কখনো দেন বিশেষ বিষয়ের ওপর এ্যাসাইনমেন্ট।

সংবাদ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হলেন বজলুর রহমান, বাংলাদেশের সাংবাদিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন, প্রচুর পড়াশোনা রয়েছে। একসময় শিশু কিশোর সংগঠন খেলাঘরের পরিচালক ছিলেন, আইওজে বাংলাদেশ গ্রুপের সভাপতি। অর্থনীতির ওপর বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বজলুর রহমান একসময় নিয়মিত লিখতেন 'হালচাল' কলামটি, 'দর্শক' ছদ্মনামে। এখনো হঠাৎ এটি প্রকাশিত হয়। ইনি সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়গুলো সম্পাদনা করেন। এমনকি কম্পিউটারে কম্পোজ হবার পর সেগুলোর ফাইনাল প্রুফ পর্যন্ত দেখেন যাতে ভুল কিছু ছাপা না হয়ে বেরোয়। এই বিভাগে সিনিয়র সহকারী সম্পাদক হিসেবে আছেন সন্তোষ গুপ্ত, কিছুদিন আগে সংবাদ পরিবার এবং আরো একটি সংগঠন পালন করেছে তার ৭০ তম জন্মবার্ষিকী। সন্তোষগুপ্ত 'অনিরুদ্ধ' ছদ্মনামে উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে থাকেন, লেখেন সম্পাদকীয় মন্তব্য, পাঠকের চিঠিপত্রগুলো সম্পাদনা করেন।

জনকণ্ঠে উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবে আছেন এক সময়কার দৈনিক বাংলার সম্পাদক এবং প্রাক্তন মুখ্য তথ্য কর্তা তোয়াব খান। তিনি এমন একজন সম্পাদক যিনি এক সময় দৈনিক বাংলায় সংবাদ পরিবেশনের পুরাতন আমলের ধারাটি ভেঙ্গে দেন, পাঠকদের পরিচিত করেন নতুন এক আঙ্গিকের দিকে। 'গুড নিউজ প্লানার' হিসেবে

www.pathagar.com

তার খ্যাতি রয়েছে। স্টাফ রিপোর্টারদের কাজের পরিকল্পনা, এ্যাসাইনমেন্ট, নিজেই দিয়ে থাকেন তিনি। জনকণ্ঠে তিনিই সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তি। প্রতিদিনই মিটিং করেন সহকারী সম্পাদকদের সাথে পরে আবার রিপোর্টারদের সাথে। পত্রিকাটির মেকআপ পরিকল্পনা তাঁরই।

তবে, কিছু কিছু পরিকল্পনা সম্পাদক আতিকুল্লাহ খান মাসুদের কাছ থেকেও আসে। যেমন জনকণ্ঠে যে শিক্ষার্থীদের পাতাটি প্রকাশিত হয় এদেশের সংবাদপত্রে যা নতুন একটি সংযোজন, তার মূল পরিকল্পক ইনিই। কিছু বিষয়ের ওপর প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয় তারই সরাসরি নির্দেশে, এগুলো 'পর্যবেক্ষক' বা কখনো 'জনকণ্ঠ রিপোর্ট' হিসেবে পাঠকের কাছে পৌঁছে।

তা, তোয়াব খান, যিনি উপদেষ্টা সম্পাদক, তিনি ডামি পর্যন্ত তৈরি করেন। এই পত্রিকায় আছেন বোরহান আহমেদ যিনি নির্বাহী সম্পাদক, তিনি সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় সম্পাদনা করেন, নিজেও প্রায়শই লেখেন, তার উল্লেখযোগ্য রচনা 'কারাগারের দিনগুলি' প্রকাশিত হয় '৯৪ তে। একটি নিবন্ধ সম্পর্কে মামলা দায়ের হলে তোয়াব খান এবং বোরহান আহমেদকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায় জনকণ্ঠ অফিস থেকে তারপর বেশ কিছুদিন জেলে থাকেন। সেই সময়কার অভিজ্ঞতা নিয়ে ধারাবাহিক রচনাটি। জনকণ্ঠে সহকারী সম্পাদক আছেন ৬ জন যারা সম্পাদকীয় বা উপসম্পাদকীয় লেখেন।

'সংবাদ'-এ সম্পাদকীয় লেখেন মতলুবার রহমান। ইনি আগে ছিলেন একজন কলেজ শিক্ষক। সহকারী সম্পাদক পদে আরো আছেন আবুল হাসনাত, সংস্কৃতিবান ব্যক্তি, রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের সদস্য, তিনি সম্পাদনা করেন 'সংবাদ' এর সাহিত্য সাময়িকীটি। সংবাদপত্রের সাহিত্য সাময়িকীতে রচনার মান ও পরিবেশন ভঙ্গিতে আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য এনেছে এই পাতাটি, যার পৃথক একটি পাঠক মহল গড়ে উঠেছে। ফরহাদ মাহমুদ একজন সহকারী সম্পাদক, আগে সহ সম্পাদক ছিলেন, এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাতাটির সম্পাদনার সাথে জড়িত।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. আব্দুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন এই পাতাটির মূল সম্পাদক। বলা যায় অতিথি সম্পাদক হিসেবে সম্মানীর ভিত্তিতে পাতাটি দেখেন, যেমন অর্থনীতির পাতা দেখেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মতিউর রহমান। সম্মানীর বিনিময়ে 'মেয়েদের পাতা' সম্পাদনা করেন।

'সংবাদ'-এ অস্থায়ী সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন খ্যাতনামা সাংবাদিক কেজি মুস্তাফা। সংবাদে আসার আগে তিনি ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ডায়লগ'-এর সম্পাদনায় ছিলেন।

একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অস্থায়ী সম্পাদক নির্বাহী সম্পাদক এঁরা মালিক, মালিক-সম্পাদক বা সম্পাদক নিয়োগকৃত ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী বেতন ভাতা পান, সাংবাদিক হিসেবেই পাঠকের কাছে পরিচিত, কিন্তু সবাই এঁরা সাংবাদিকদের দাবিদাওয়া আদায়ের সংগঠন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সদস্য নন। তবে সহকারী সম্পাদকদের অনেকেই সদস্য।

www.pathagar.com

তবে ঢাকার বাইরের পরিস্থিতি এলাকা বা পত্রিকা বিশেষে অন্যরকম। বগুড়া থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক 'চাঁদনীবাজার' এর সম্পাদক যিনি আবার বাংলাদেশ টেলিভিশনেরও সংবাদদাতা, তিনি বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য।

নিয়োগপ্রাপ্ত সম্পাদক, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, অস্থায়ী সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, এরা নানাভাবে কাজ করে থাকেন। কোন পত্রিকার নিয়োগপ্রাপ্ত সম্পাদক বার্তা ও সম্পাদকীয় পরিকল্পনা করেন আর পরিচালনাগত বা প্রশাসনিক কাজও করে থাকেন। একটি দৈনিকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় সম্পাদনা ছাড়াও প্রয়োজন দেখা দিলে কিছু প্রশাসনিক কাজকর্মও করেন। একটি পত্রিকার অস্থায়ী সম্পাদক বার্তা সম্পাদনা করেন। একটি পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সম্পাদকীয় বিভাগ পরিচালনা ছাড়াও কখনো বিশেষ বিশেষ প্রতিবেদন সম্পাদনা করেন আবার তিনি পরিচালনাগত প্রশাসনিক কাজকর্মও করে থাকেন। হালে একটি পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে গিয়ে স্বনামে প্রতিবেদন লিখেছেন এবং ছাপাও হয়েছে।

লিমিটেড কোম্পানী থেকে প্রকাশিত কোন কোন পত্রিকায় আছেন নির্বাহী পরিচালক, এরা পত্রিকা পরিচালনাগত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও সময় থেকে সময়ে রিপোর্টারদের নিয়ে মিটিং করেন, কখনো কখনো তাদের বিশেষ এ্যাসাইনমেন্টও দেন। নির্বাহী পরিচালক পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, পত্রিকা প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কাজই তাকে চোখে রাখতে হয়। বিজ্ঞাপনের টাকা আদায় হলো কি-না, সার্কুলেশন বাড়লো না কমলো, তহবিলের অবস্থা কি রকম, সাংবাদিক কর্মচারীদের বেতন দেয়া যাবে কি-না সময়মতো, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ছুটাছাটা অনুমোদনের কাজটিও তাঁকে করতে হয়। বলা বাহুল্য দারুণ টেনশনের কাজ।

সহকারী সম্পাদকরা কেবল যে সম্পাদকীয় বা উপসম্পাদকীয় লেখেন তা নয়। আগে একজায়গায় বলেছি এদের কেউ কেউ মূল কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিংবা কেউ একক দায়িত্ব হিসেবে চিঠিপত্র সম্পাদনা করেন, সাহিত্য সাময়িকী বিভিন্ন ফিচার পাতা সম্পাদনা করেন। সম্পাদনা করেন বিভিন্ন কলামিস্টদের কাছ থেকে পাওয়া লেখা।

. . . পত্রিকা বিশেষে একেক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের বসবার ঘর-কামরা একেকরকম। যেমন ইত্তেফাকে সহকারী সম্পাদকদের আলাদা আলাদা কামরা আছে, আছে ইন্টারকম টেলিফোন ব্যবস্থা, দৈনিক পত্রিকার ফাইল, এটাওটা কাজের জন্যে পিওন। সংবাদ বা ভোরের কাগজে আবার বড়-সড় একটি কামরায় কয়েকজন সহকারী সম্পাদক বসেন আলাদা আলাদা টেবিলে। সেখানেও টেলিফোন সংযোগ, পত্রিকার ফাইল, কাজের লোক আছে। এরই এক টেবিলে কেউ সম্পাদকীয় লিখছেন, কেউ উপসম্পাদকীয় লিখছেন বা কলামিস্টদের কাছ থেকে পাওয়া উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ সম্পাদনা করছেন, কেউ আবার চিঠিপত্রগুলো সম্পাদনা করছেন।

সম্পাদকীয় উপসম্পাদকীয় লেখা বা প্রাপ্ত নিবন্ধ সম্পাদনার পর সেগুলো দেয়া হয় সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বা নির্বাহী সম্পাদকের কাছে। চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেগুলো তিনি কম্পোজের জন্যে পাঠান। কোন কোন সহকারী সম্পাদক, যারা সিনিয়র, যাদের

www.pathagar.com

লেখা দেখবার দরকার নেই, তারা নিজেরাই সরাসরি লেখা পাঠিয়ে দেন কম্পোজের জন্যে। কম্পোজ হয়ে সেগুলো চলে যায় রিডিং সেকশনে, সেখানে সংশোধনের কাজ চলে, ফাইনাল প্রুফটি দেখে নেন লেখক নিজেই কিংবা সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান।

আপনি যদি কোন সংবাদপত্র অফিসের সম্পাদকীয় বিভাগে ঢোকেন, দেখবেন একমনে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছেন সহকারী সম্পাদকগণ। কেউ পত্রিকা পড়ছেন, কেউ রেফারেন্স ঘাঁটছেন, সামনে চায়ের কাপ, সিগারেটের ধোঁয়া উড়ছে। এই দৃশ্য অবশ্য পিক আওয়ারের জন্যে, যখন মূল লেখা বা সম্পাদনার কাজ চলে।

এর বাইরে, এমনও সময় আসে, যখন দেখা যায় কামরায় জমে উঠেছে আড্ডা। আসেন সেখানে কলামিস্ট, আসেন লেখক শিল্পী সাহিত্যিক, কখনো আসেন রাজনৈতিক দলের নেতা, সংবাদপত্র-ঘনিষ্ঠ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনেক সময়, এই আড্ডার মাঝেও কোন কোন সহকারী সম্পাদকের কাজ চলে। পত্রিকা পড়া এবং রেফারেন্স খোঁজাখুঁজি এই কামরার একটি স্বাভাবিক পরিচিত দৃশ্য। নিজ নিজ পত্রিকা তো পড়তেই হয়, খুঁটিয়ে দেখতে হয় আর কোন কোন পত্রিকায় কি কি বিষয়ের ওপর সম্পাদকীয় ছাপা হলো, কারা কি উপসম্পাদকীয় লিখলেন।

দেশ-বিদেশের খবরগুলোও পড়তে হয় তাদের, গাঁও গ্রামের খুব ছোট খবরও পড়তে হয়। ধানকাটা নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছে যমুনার চরে, হতাহত কয়েকজন, কিংবা ভেজাল তেল খেয়ে রোগাক্রান্ত হয়েছে সিরাজগঞ্জে কিংবা মৌলভীবাজারের ফল চাষীরা ন্যায্যমূল্য বঞ্চিত, এসব খবরও চোখ এড়ালে চলে না। এমন হতে পারে যে, সহকারী সম্পাদক এ নিয়েই লিখবেন। সেক্ষেত্রে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় রেফারেন্স।

সম্পাদকীয় বিভাগের জন্যে রেফারেন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এজন্যে পুরাতন কাগজে কি কি ছাপা হয়েছে তা দেখতে হয়, প্রয়োজনে তথ্যও ব্যবহার করতে হয়। এই রেফারেন্স আসে নানাভাবে। কেউ রেফারেন্স পান পুরাতন পত্রিকা থেকে, কেউ লাইব্রেরী থেকে ক্লিপিং ফাইল আনিয়ে নেন, বিভিন্ন বিষয়ে কারো কারো নিজস্ব জ্ঞানই থাকে, কেউবা অন্যকারো কাছ থেকে বিষয়ের বিস্তারিত জেনে নেন।

আবার এমনও হয় যে, বিশেষ কোন বিষয়ে জানার জন্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় বা ব্যক্তির সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়ে থাকে। মনে করুন, একটি পত্রিকায় সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে, 'ডায়রিয়ার প্রকোপ' নিয়ে। সেখানে আপনি পড়ছেন যে, ডায়রিয়ায় বাংলাদেশে কোন বছর কতো জন মারা গেছে তার তথ্য পরিসংখ্যান। তা পাঁচ দশ বছর আগের এসব তথ্য পরিসংখ্যান কোথায় পেলেন সম্পাদকীয় লেখক? পেতে পারেন তিনি বিভিন্নভাবে। যেমন : হতে পারে গতবছরও এই সময়ে তিনি ডায়রিয়ার ওপর সম্পাদকীয় লিখেছিলেন এবং সেই তথ্য পরিসংখ্যান তার মনে আছে। অথবা সম্পাদকীয় লিখে দিলেন অপর একজন সহকারী সম্পাদক, তিনি তার স্মরণ থেকে তথ্য-পরিসংখ্যান নিলেন।

তবে, মূলত এগুলো মেলে রেফারেন্স ফাইল থেকে। লাইব্রেরীতে আছে ডায়রিয়ার খবর সংক্রান্ত ক্লিপিং ফাইল। তাতে কেটে কেটে সাঁটানো আছে সময়ে সময়ে প্রকাশিত ডায়রিয়া বিষয়ক সম্পাদকীয়, কিংবা আছে প্রতিবেদন। সহকারী সম্পাদক ঐ ফাইলটি

www.pathagar.com

আনিয়ে নেন লাইব্রেরী থেকে। এই যে ক্লিপিং ফাইল, তা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রকাশিত পৃথক পৃথকভাবে তৈরি। এতে শুধু নিজের পত্রিকার ক্লিপিং থাকে না, থাকে অন্যান্য পত্রিকারও।

ইত্তেফাকের ফাইলে মিলবে সংবাদে পাঁচ দশ বছর আগে ডায়রিয়া বিষয়ে লেখা সম্পাদকীয় মন্তব্য। এই যে রেফারেন্স ফাইল তা দুভাবে তৈরি হয়। কেউ বাঁধাই করা খাতায় ক্লিপিং আঠা লাগিয়ে রাখে, কেউ সেঁটে রাখে সাদা কাগজে, তারপর একমুখো বাঁধাই করে রাখা হয়। এছাড়াও, বছর ও মাস ওয়ারী বাঁধাই করা আছে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা। 'সংবাদ'-এর কথা বলি : গড়ে তোলা হয়েছে সৈয়দ নুরুদ্দিন স্মৃতি পাঠাগার। এখানে আছেন একজন লাইব্রেরীয়ান, আছেন একজন সহকারী। লাইব্রেরীতে সাংবাদিকতা ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর প্রচুর বই রয়েছে, দেশী-বিদেশী পত্রিকা রয়েছে, তাছাড়াও রয়েছে বাঁধাই করা নতুন পুরাতন পত্রপত্রিকা। সবগুলো নয়, প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকাগুলো বছর ওয়ারী সাজানো আছে।

এছাড়াও আছে বাঁধাই করা ক্লিপিং ফাইল। তাতে কেটে রাখা হয়েছে সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, আন্তর্জাতিক খবর, জাতীয় ভিত্তিক খবর, দেশের বিভিন্ন স্থানের খবর। একটি ফাইলের প্রচ্ছদে লেখা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অর্থাৎ এর ভেতর সাঁটানো আছে নতুন পুরাতন খবর, সম্পাদকীয় মন্তব্য। লাইব্রেরী সহকারীর নিত্যকার কাজ এটাই যে সংবাদপত্র বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর খবর সম্পাদকীয় তিনি কাটছেন, সাল তারিখ লিখছেন আর সেগুলো পৃথক পৃথক ফাইলে সেঁটে রাখছেন।

. . . একটি পত্রিকার জন্যে লাইব্রেরী আর লেখার জন্যে রেফারেন্স হিসেবে এই সব ক্লিপিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহকারী সম্পাদকগণ ছাড়াও এ থেকে উপকৃত হন রিপোর্টাররা, কাজে লাগে বিভিন্ন নিবন্ধ রচয়িতা বা সমাজ গবেষকদের। কিন্তু, সংবাদপত্রের আধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত হলেও অধিকাংশ পত্রিকায় রেফারেন্স লাইব্রেরী গড়ে ওঠে নি এখনো।

সম্পাদকীয়গুলো লেখা হয়ে থাকে পূর্ব আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে। ঠিক হয় কে কোন্ বিষয়ের ওপর লিখবেন। অধিকাংশ পত্রিকায় সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বা নির্বাহী সম্পাদকের সাথে মিটিং হয় সম্পাদকীয় নিয়ে। কোন কাগজে রুটিনের মতো ছক বাঁধা আছে কোনজন কবে সম্পাদকীয় লিখবেন কবে উপসম্পাদকীয় লিখবেন।

আবার কোন কোন পত্রিকায়, সম্পাদনা বিভাগ যেখানে দুর্বল, সেখানে ইচ্ছেমতো লেখালেখি হয়ে থাকে, সহকারী সম্পাদক পদে লোক কমতি থাকলে একজনকেই একাধিক সম্পাদকীয় লিখতে হয়। এটা অবশ্য খুব কম সার্কুলেশন, তেমন পত্রিকার ব্যাপার।

ঢাকার বাইরের জেলাগুলোর দৈনিক পত্রিকাগুলোতে সম্পাদকীয় লেখার বিষয় নির্বাচন, পলিসি, এসব নিয়ে এডিটরিয়াল মিটিং খুব একটা হয় না দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া। সম্পাদক সেখানে একজনকে বললেন পছন্দসই একটি বিষয় নিয়ে লিখতে, সহকারী সম্পাদক তাই লিখে দিলেন। কখনো কখনো সহকারী সম্পাদক নিজেই বাছাই করে নেন বিষয়। উপসম্পাদকীয় স্তম্ভে ছাপা হয় বাইরের কারো লেখা, কখনো ছাপা হয়

www.pathagar.com

ফিচার, স্বনামে বেনামে নিবন্ধ লেখেন কখনো সহকারী সম্পাদক কখনোবা একজন রিপোর্টারও।

রাজশাহী থেকে প্রকাশিত জাতীয় সংবাদপত্র দৈনিক বার্তায় সম্পাদকীয় বিভাগ রয়েছে যারা সম্পাদকীয়, স্বনামে বেনামে উপসম্পাদকীয় লিখে থাকেন, বাইরের কারো নিবন্ধও নেয়া হয়।

ঢাকার জাতীয় দৈনিকগুলোর মধ্যে চার পাঁচটি কিন্তু ইতোমধ্যেই সম্পাদকীয় স্তম্ভের পুরাতন প্রচলিত ধারাটিকে ভেঙ্গে দিয়েছে। আজাদ আমলে যেমনটি দেখা যেতো যে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে বিশাল একখানা, কেউ পড়ুক না পড়ুক রোজই পাক্কা দুই কলাম জায়গা নিয়ে ছাপা হচ্ছে, সেটি কয়েকটি সংবাদপত্র বাদ দিয়েছে। যেমন ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, বাংলাবাজার পত্রিকা, এগুলোতে খুব ছোট আকারের সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচন করা হচ্ছে, ছোট ছোট বাক্যে লেখা হচ্ছে। টাইপ দেয়া হচ্ছে বড় পয়েন্টের। কোন কোন সম্পাদকীয়তে মূল বক্তব্য অংশটি ইনসেটে দেয়া হচ্ছে।

আগে, যেগুলো পত্রিকা একটি মাত্র দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করতো, সেগুলোতেও এসেছে পরিবর্তনের মৃদু হাওয়া। দুটি করে সম্পাদকীয় দেয়া হচ্ছে। প্রথমটিতে যেটি থাকে সেটি পত্রিকা অফিসে পরিচিত এডিটরিয়াল-ওয়ান, আর নিচেরটি, আকারে ছোট, মাঝে মধ্যে সরস হালকা বিষয় নিয়ে লেখা হয়, এটি এডিটরিয়াল-টু।

সম্পাদকীয় হলো পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, এতেই প্রতিফলিত হয় সম্পাদকের (কোন কোন ক্ষেত্রে মালিকেরও) নীতি-ভাষ্য, কিন্তু সত্যি বলতে কি, এর পাঠক সংখ্যা কম। এই ব্যাপারটিকে সামনে রেখেই কয়েকটি পত্রিকা বিষয় নির্বাচন, আকার, লেখার ধরন, পরিবেশনার স্টাইল বদলে ফেলেছেন। এটি নতুন সংযোজন। দেখাদেখি ঢাকার বাইরের জেলাশহর থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলোও অনেকে আজকাল সম্পাদকীয়'র আকার সংক্ষিপ্ত করেছে, টাইপ বড় দিচ্ছে।

ঢাকার জাতীয় পত্রিকা, যেগুলো এখনো দুটি করে সম্পাদকীয় ছাপে, প্রথমটি আকারে বড় দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ছোট। সেগুলোতেও বিষয় নির্বাচনে বদল হয়েছে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখা, জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, হাল সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। আর্থ-সামাজিক অবস্থা, এসব বিষয় এসেছে। তথ্য পরিসংখ্যানের ভার-ভারিক্কির বদলে এসেছে যুক্তি, এসেছে সহজসরল ভাষায় লেখার প্রবণতা। কিছু ব্যঙ্গ বিদ্রূপও থাকছে। অর্থাৎ, আকার ও পরিবেশনা ভঙ্গিতে পরিবর্তন না এলেও, এমন চেষ্টা করা হচ্ছে যে, বেশি সংখ্যক পাঠক যেনো সম্পাদকীয়গুলো পড়েন।

উপসম্পাদকীয়, যাকে বলা হয় পোস্ট এডিটরিয়াল, সেগুলো পরিবেশনার স্টাইলেও গত কয়েক বছরে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পুরাতন আমলে, এরকম ছিল যে, সম্পাদক নিজে বা সহকারী সম্পাদক পোস্ট এডিটরিয়াল লিখতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো ছদ্মনামে ছাপা হতো।

যেমন, ইত্তেফাকে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া লিখতেন 'রাজনৈতিক মঞ্চ'। 'মিঠেকড়া' লিখতেন ভীমরুল (আহমেদুর রহমান)। আখতারুল আলম 'লুব্ধক' নামে

www.pathagar.com

'স্থান কাল পাত্র' লিখতেন। সংবাদে দরবারে জহুর লিখতেন জহুর হোসেন চৌধুরী, 'বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা' লিখতেন আবু জাফর শামসুদ্দিন, হালচাল কলামের 'দর্শক' বজলুর রহমান, সন্তোষগুপ্ত এখনো অনিরুদ্ধ নামে নিয়মিত লিখছেন। দৈনিক বাংলায় আহমেদ হুমায়ুন দীর্ঘদিন 'নগর দর্পণ' লিখেছেন 'সুপান্থ' নামে। 'দুর্জন উবাচ' নামে বিচিত্রা ও দৈনিক বাংলায় বহু ব্যঙ্গাত্মক নিবন্ধ লিখেছেন খন্দকার আলী আশরাফ। এখন ইত্তেফাকে মহাদেব সাহা, জিয়াউল হক, আবেদ খান লিখছেন। এই পত্রিকায় হাবিবুর রহমান মিলন নামে লিখতেন। জনকণ্ঠে এখন বোরহান আহমদ, শুভ রহমান, শামসুদ্দিন এঁরা লিখছেন।

আগে ছদ্মনাম ব্যবহৃত হতো মূলত নিরাপত্তা জনিতকারণে। এখন আর ছদ্মনামগুলো পাঠকের কাছে লুকানো থাকছে না। এর কারণ একই। মানুষের জানার আগ্রহ বেশ, আর প্রিয় কলামটি কে লেখেন সেটা কোন না কোনভাবে জেনে নেন। সামাজিক সম্পর্কসূত্রে অনেক পাঠক সংবাদপত্র কিংবা সাংবাদিকদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন।

টেলিযোগাযোগের আধুনিকায়ন ও ব্যাপক সম্প্রসারণের কারণে রাজধানী থেকে দূর অবস্থানে বসবাসকারী অনেকেও মিডিয়ার লোকজনদের খোঁজখবর নেন, পরিচিতি জানেন। দ্বিতীয়ত কোন কোন উপসম্পাদকীয় রচয়িতার ছদ্মনামটি সভা অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যই বলা হয়, পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়, পত্রিকাতেও তা ছাপা হয় যেটা ছিল প্রথার মতো ব্যাপার, আজ তা অপ্রয়োজনীয়। তবু আজও অনেকে ছদ্মনামের আড়ালে পাঠকদের জানা-অজানায় থাকছেন।

অবশ্য কিছু পত্রিকায় ছদ্মনামে লেখার ব্যাপারটি এখন পুরোপুরিভাবেই লুপ্ত হয়ে গেছে। ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, বাংলাবাজার পত্রিকায়, ছদ্মনামে বেরোয়না কোন লেখা, বরং নামের সাথে সাথে লেখকের পেশা পরিচয় পর্যন্ত দেয়া হয় লেখার শেষে। এসব কাগজে আজকাল কেবল সহকারী সম্পাদকরা লিখছেন না, লিখছেন দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা, ব্যাংকার, প্রাক্তন বিচারপতি, চিকিৎসক, আইনজীবী, এনজিও কর্তা-কর্মীরা।

বেশ কিছু তরুণ সাংবাদিকও আজকাল সম্পাদকীয় পাতায় নিবন্ধ লিখছেন। অনেকের নিবন্ধ আসছে ঢাকার বাইরে থেকেও। এক কথায়, সম্পাদকীয় পাতায় আগে যে নিয়মটি ছিল, সহকারী সম্পাদকরা স্বনামে-বেনামে কিংবা হাতে গোনা সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব এতে লিখতেন, তা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে বেশ কটি সংবাদপত্র।

উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ পাতাটিতেও বৈচিত্র এসেছে। কেউ এটা পছন্দ করছেন, কেউ করছেন না। আগেকার যে নিয়ম, তাতে থাকতো রোজ একটি করে দীর্ঘ সম্পাদকীয়। তার ডানদিকে ৬ কলাম জুড়ে একটি বা দুটি নিবন্ধ। থাকতো পাঠকের চিঠিপত্র। এখন, বেশক'টি পত্রিকায় দুপাতা জুড়ে তিন চারটি নিবন্ধ প্রকাশ করা হচ্ছে। সম্পাদকীয় পাতার কলাম, আগে যা ছিল মাপা মাপা ৮ কলাম, তা ভেঙ্গে কলামের নতুন মাপ এসেছে। আগে সম্পাদকীয় পাতায় নির্দিষ্ট লেখা (সম্পাদকীয় আর উপসম্পাদকীয়) ছাড়া দেয়া হতো পাঠকের চিঠিপত্র, এখন তাতেও এসেছে ব্যাপক পালাবদল।

www.pathagar.com

জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, বাংলাবাজার পত্রিকায় এমনটি দেখা যাচ্ছে বেশ কিছুদিন থেকে। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে সংযোজিত হয়েছে নতুন নতুন বিভাগ, নতুন নতুন লেখা। জনকণ্ঠ সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশ করছে একস্লিপ টাইপের ইন্টারেস্টিং কিছু রিপোর্ট, এগুলোতে সংযোজিত হয়েছে কার্টুন পর্যন্ত। একই পাতায় ছাপছে তারা জানার মতো বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর বিষয় থেকে শুরু করে খনার বচন পর্যন্ত। ভোরের কাগজ তাদের সম্পাদকীয় জোড়া পাতার একধারে ফিচার দিচ্ছে। আজকের কাগজেও এমন হচ্ছে। বাংলাবাজার একটি নতুন বিভাগ চালু করেছে চিঠিপত্র কলামের সাথে। এটি হলো 'জনতার মঞ্চ'। এতে পাঠকের কাছ থেকে পাওয়া সমস্যাভিত্তিক চিঠিপত্রতো ছাপা হচ্ছেই, সেইসাথে চিঠির বিষয়গুলোর ওপর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বক্তব্যও ছাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এটা নতুন সংযোজন। এই পত্রিকাটিতে কোন কোন রিপোর্টারের বড় আকারের প্রতিবেদন, যা নিবন্ধ আকারে লেখা, উপসম্পাদকীয় কলামে ছাপানো হচ্ছে। আগে, এরকম একটা নিয়ম ছিল যে, রিপোর্টিং টেবিলে বা সাব এডিটরদের ডেস্কে যারা কাজেকর্মে দুর্বল, তাদেরকেই ডেস্ক-এ বসিয়ে দেয়া হতো চিঠিপত্র সম্পাদনার কাজে। এখন ভালো লেখাপড়া জানা এবং চৌকশ সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞ কেউ চিঠিপত্র সম্পাদনা করেন। চিঠিপত্র বিভাগটি আকারে আয়তনে বড় করা হয়েছে, কেউ দিচ্ছে সপ্তাহের একদিন পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে। চিঠিপত্রে কার্টুনও সংযুক্ত হয়েছে একাধিক পত্রিকায়।

আমাদের সংবাদে, গল্প করে বলার মতো ব্যাপার যে, সন্তোষগুপ্তের মতো খ্যাতিমান সাংবাদিক পাঠকের চিঠিপত্রগুলো সম্পাদনা করেন। অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে সংবাদ, আজকের কাগজ পাঠকের চিঠিপত্র, তা ছাপা না হলেও তার প্রাপ্তি স্বীকার করে, কি কারণে চিঠি ছাপা গেল না, তা জানিয়ে দেয়।

আপনি ইচ্ছে করলে জাতীয় আঞ্চলিক বা স্থানীয় কোন সমস্যা নিয়ে চিঠি লিখতে পারেন, তবে চিঠি সংক্ষিপ্ত হওয়া ভালো। পুরো নাম ঠিকানা অবশ্যই দিতে হবে, আর চিঠি লিখতে হবে কাগজের একদিকে। লেখায় সাধু চলতির মিশ্রণ, বানান ভুল, হিজিবিজি করে লেখা, ঘোরানো প্যাচানো অতি দীর্ঘ বাক্য, এসব থাকলে চিঠি পাঠোদ্ধার করা হবে মুস্কিল, সেক্ষেত্রে সেটা ছাপা হবে না।

কোন পত্রিকা অফিসে গেলে দেখবেন, যিনি চিঠিপত্র সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন তার টেবিলে দেশের বিভিন্ন শহর বন্দর গ্রামগঞ্জ থেকে আসা চিঠির স্তূপ। কোনটা টেবিলে, কোনটা বক্স ফাইলে। সম্পাদনাকারী সেগুলো বাছাই করেন, ঠিক করে নেন যে বিষয়গতভাবে কোন্‌টা ছাপার যোগ্য। তারপর সম্পাদনা করতে বসেন। সম্পাদনা মানে আকারে দীর্ঘ চিঠি হলে তা সংক্ষিপ্ত করা হয়, বানান সংশোধন করে নেয়া হয়, দেয়া হয় একটি শিরোনাম। কোন কোন পত্রিকায় আবার চিঠি পুনর্লিখনের ব্যবস্থাও রয়েছে। চিঠির বিষয়বস্তু কিংবা ভাষা ঠিকই থাকলো, তবে খুব সংক্ষিপ্ত করা হলো, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা হলো।

সাধারণ একটা ধারণা বা মাপ থাকে যে, পত্রিকায় চিঠিপত্র ছাপা হবে কতোটুকু জায়গা জুড়ে। সম্পাদনাকারী ততোটা চিঠিপত্র কম্পোজ বিভাগে পাঠিয়ে দেন।

www.pathagar.com

একাজটি হয় দিনের ভাগে। কোন কোন পত্রিকায় চিঠিপত্র কম্পোজ করে রাখা হয় আগাম। আজ যে চিঠিখানা ছাপা হচ্ছে তা হয়তো দুদিন আগে কম্পোজ করা। কোন কোন পত্রিকায় দিনের চিঠি আগের দিন কম্পোজ করা হয়। ব্যাপারটি নির্ভর করে কোন্ পত্রিকায় কম্পিউটার সংখ্যা লোকবল এবং চিঠিপত্র সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত সাংবাদিকটির কর্মতৎপরতা কি রকম, তার ওপর।

অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকায় চিঠিপত্র ছাপা হয় সম্পাদকীয় পাতায়, সাধারণত নিচের দিকে। কোন কোন পত্রিকায় সপ্তাহের এক বা একাধিক দিন উপসম্পাদকীয় বাদ দিয়ে পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে (কেবলমাত্র সম্পাদকীয় কলাম ছাড়া) চিঠিপত্র ছাপা হয়। যেমন : সংবাদ বৃহস্পতিবার প্রায় একপাতা জুড়ে চিঠিপত্র ছাপে।

বাংলাবাজার পত্রিকায় জনতার মঞ্চ ছাপা হয় বেশ বড় জায়গা নিয়ে। বাংলাবাজার পত্রিকায় পত্রের সাথে উত্তরপত্র চালু করা হয়েছে যা পাঠক আকর্ষিত হয়েছে। আজকের কাগজ, দৈনিক বাংলা, ইত্তেফাক সব কাগজেই চিঠিপত্র অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ছাপা হচ্ছে। চিঠিপত্র গুরুত্ব পাচ্ছে সাপ্তাহিক বিচিত্রা, যায়যায়দিন এবং আর সব সাপ্তাহিকীতেও। বিচিত্রা পত্রিকার প্রথম দিকেই দুপৃষ্ঠা জুড়ে দেয় চিঠিপত্র। যায়যায়দিন-এর 'মেলব্যাগ' এ খুব সুন্দর সব চিঠি ছাপা হয় যা থেকে মেলে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থার চিত্র। এ দুটি পত্রিকায় চিঠিপত্রগুলো 'ওয়েল এডিটেড'।

দৈনিক পত্রিকায়, বেশ কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে যে, চিঠিপত্রগুলোর ডিসপ্লেতে নতুনত্ব এসেছে। গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বক্স করে ছাপা হচ্ছে। দৈনিক বাংলায় একটি চিঠি, যেটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত, সেটিকে ওপরের দিকে এনে বেশ বড়ো এবং আকর্ষণীয় শিরোনাম দেয়া হয়, আলাদা আলাদা শিরোনামে ছাপা হয় আরো কিছু চিঠি। কোন কোন পত্রিকায় সেরা চিঠির জন্যে পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেয়া হয় কিছু প্রাইজবণ্ড বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঐ পত্রিকার সৌজন্য কপি।

সমস্যা ছাড়াও আপনি লিখতে পারেন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এসব নিয়ে আপনার মন্তব্য। বিভিন্ন জেলা-থানা সফরের সময়, এমন কিছু পাঠকের সাক্ষাৎ পাই, যারা এরকম মনে করেন যে, চিঠিপত্র পাঠাতে হয় বুঝি পত্রিকার স্থানীয় সাংবাদিকের মাধ্যমে। তা নয়, আপনি চিঠিপত্র পাঠাবেন পত্রিকার ঠিকানায়, সরাসরি। খামের ওপর 'চিঠিপত্র বিভাগের জন্যে' কথাটা লিখলে ভালো, পত্রিকা অফিসে চিঠিপত্র বাছাইয়ের সুবিধা হয়।

যিনি চিঠিপত্র সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত, তার টেবিলে সোজা যেতে পারে। মনে করুন আপনি একখানা চিঠি পাঠালেন একজন সম্পাদকের নামে। কিংবা ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বা নির্বাহী সম্পাদকের নামে। নামে চিঠি হলে ব্যক্তিগত চিঠি মনে করে তা চলে যাবে ওঁদের টেবিলে। সেটি খোলার পর যখন বোঝা যাবে যে এটা চিঠিপত্র কলামে ছাপার জন্যে পাঠিয়েছেন, তখন তা আবার পাঠানো হবে চিঠিপত্র সম্পাদনাকারীর টেবিলে। সেক্ষেত্রে সময় লাগতে পারে। কিন্তু, সরাসরি যদি 'চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশের জন্যে' এই কথাটি লিখে দেন খামের ওপর, তাহলে সংশ্লিষ্ট বিভাগেই তা খোলা হবে।

www.pathagar.com

এমনও কারো কারো ধারণা আছে যে, চিঠিপত্র ছাপাতে বুঝি টাকা পয়সা লাগে। না, কোনরকম টাকা পয়সা লাগে না। ডাক খরচটাই আপনার ব্যয়। গাঁও-গ্রাম ঘোরার সময় আমার হাতেও চিঠিপত্র দেন কোন কোন পাঠক, কিংবা থাকবার আস্তানায় নিয়ে আসেন। তাদের প্রশ্ন এরকম : দেখেন তো এই চিঠি ছাপাতে কতো খরচ পড়বে? তাদের বোঝাতে হয় যে টাকা পয়সা লাগে না, শুধু চিঠিখানাই পাঠিয়ে দিন।

আসলে পত্রিকা সম্পর্কিত সাধারণ মানুষের তথ্যশূন্যতার কারণে এরকম হয়। ঢাকাতেও কোন পত্রিকার অফিসে চিঠিপত্র বিভাগে দেখেছি প্রেরিত চিঠির সাথে আলাদা একখানা চিরকুট যোগ করে জানতে চাওয়া হয়, এটা ছাপাতে কত টাকা লাগবে? ছাপা হলে বিল পাঠাবেন, ইত্যাদি। চিঠিপত্রের ব্যাপার শুধু নয়, আরো অনেক ব্যাপারে এক শ্রেণীর পাঠকের আছে অজ্ঞতা।

কেউ হয়তো চিঠি লিখছেন 'সংবাদ' সম্পাদক সাহেবের কাছে। 'সম্পাদক কথাটার ইংরেজী করেন তারা সেক্রেটারি। কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সম্পাদক মানে ইংরেজীতে সেক্রেটারী। তারই সাথে গুলিয়ে ফেলেন পত্রিকার সম্পাদকের পদটিকে। ঢাকায় কাজ করবার সময় আমাদের সংবাদ-এর টেবিলে এরকম বেশ কটি চিঠি দেখেছি, যা বাইরে থেকে আসা, খামের ওপর লেখা হয়েছে 'প্রাপক সেক্রেটারি, দৈনিক সংবাদ।'

বাংলায় হলে সম্পাদক লিখুন, ইংরেজীতে হলে এডিটর। পত্রিকার ঠিকানা যেনো হয় নির্ভুল। প্রত্যেকটি পত্রিকার পেছনে (প্রিন্টার্স লাইনে) লেখা আছে সেই পত্রিকার ঠিকানা। আছে পোস্টাল কোড নম্বর। এটা উল্লেখ করুন। এমন কিছু দৈনিক আছে, যেগুলোতে পত্রিকার নাম লিখে তার নিচে ঢাকা লিখে দিলেই ঐ পত্রিকায় চিঠি ডেলিভারী হয়ে যায়। এগুলো বহুল প্রচারিত কিংবা দীর্ঘ বছর ধরে প্রকাশিত দৈনিক। ঢাকা জিপিওতে চিঠি গেলেই পিওন চিনতে পারে, বিলি হয়ে যায়। কিন্তু এমনও পত্রিকা আছে যা নতুন বেরিয়েছে, ডাক বিভাগের বাছাই কর্মচারী কিংবা পিওন তার নামও জানে না, সেখানে চিঠি দিতে হলে পূর্ণ ঠিকানা অবশ্যই লিখুন।

চিঠিপত্র কলামে আগে সাধারণত সমস্যাভিত্তিক বিষয় ছাপা হতো। এখন রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি ছাড়াও আরো বহু বিষয় উঠে এসেছে। চিঠিপত্র লেখকরা কেবল ঘটনা জানাচ্ছেন না, সেইসাথে মন্তব্য মতামতও দিচ্ছেন। জনগুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় নিয়ে এখন চিঠিপত্র কলামে লেখা হয় যা আগে দেখা যেতো না। অনেকগুলো চিঠি তো শিক্ষণীয় ব্যাপার। যেমন 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত 'শব্দ-অনুসন্ধান'। এ চিঠি পড়ে বহু পাঠক লিখছেন। একজনের চিঠি নিয়ে একাধিক পাঠকের মতামত ছাপা হচ্ছে। রীতিমত বিতর্ক জমে উঠেছে একেকটি বিষয়ের ওপর।

চিঠিপত্র বিভাগে, সেই আজাদ আমল থেকে দেখা যেতো লেখা থাকতো এরকম একটি লাইন 'মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী নহেন'। দুয়েকটি সংবাদপত্রে এখনো এটা আছে। অনেকে কথাটা বাহুল্য বিবেচনা করে তুলে দিয়েছেন। মনে হয় কারো চিঠিপত্রের বক্তব্য নিয়ে আইনগত যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, সেটা এড়ানোর জন্যে ঐ কথা লেখা হয়েছিল একদা। কিন্তু দীর্ঘবছরে হাজারো চিঠি ছাপা হবার পরেও, এমন

www.pathagar.com

কোন উদাহরণ নেই যে, পাঠকের কোন চিঠি নিয়ে পত্রিকার সম্পাদক মামলায় জড়িয়েছেন। তা সত্ত্বেও লাইনটি ছাপা হয়েই যাচ্ছে।

একজন সম্পাদক মানে নিজেই একটি ইন্সটিটিউশন, প্রভাবশালী, মর্যাদাবান। বহু দায়দায়িত্ব নিয়ে তিনি প্রকাশ করেন একটি পত্রিকা। দেশ ও জাতির সংকট মুহূর্তে দক্ষ লেখনী নিয়ে সামনে আসেন কোন কোন সম্পাদক। অর্থাৎ এককথায়, সম্পাদক হলেন গুরু দায়দায়িত্ব পালনের এক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তিনি কেন নিতে অপারগ পাঠকের মতামতের দায়? আজকাল সংবাদ, সম্পাদকীয় উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ এইসব নিয়ে কিছু সম্পাদককে হয়রানি করা হচ্ছে। ঢাকায় কেবল নয়, মামলা দায়ের হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায়। এ ক্ষেত্রে ঐসব লেখা বা লেখার মতামত মন্তব্যের দায়-দায়িত্ব সম্পাদক সাহেব নিজের শক্ত কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আর পাঠকের মতামতের দায়-দায়িত্ব খুবই কি বিরাট যে তা কাঁধে নেয়া যাবে না?

আসলে, মনে হয় বহুবছর ধরে কথাটি চালু রয়েছে বলে আজো 'মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন' ছাপানো হয়ে থাকে। বলা যায় ট্রাডিশন। আধুনিক সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার দিনে, এটা ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে। এখন আর ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, বাংলাবাজার পত্রিকা কিংবা বিচিত্রা, যায় যায় দিন এসব সাপ্তাহিকীতে সম্পাদকের দায়দায়িত্বের ব্যাপারটি লেখা হয় না।

প্রায় সবগুলো পত্রিকার পাঠকের চিঠিপত্র কলামটির সুন্দর সম্পাদনা হচ্ছে, মনোহারী নাম দেয়া হয়েছে, পরিবেশন ভঙ্গিতে এসেছে নতুনত্ব, এমনকি ইলাস্ট্রেশন হচ্ছে, কার্টুন সংযুক্ত হচ্ছে। প্রতিভাধর কিছু তরুণ সাংবাদিক চিঠিপত্র কলাম-এর দায়িত্ব পাওয়ায় ঐ পাতার চেহারাটাই বদলে গেছে বা যাচ্ছে। একাধিক সম্পাদক সম্পর্কে জানি যারা নিজে শত ব্যস্ততার মাঝেও চিঠিপত্র বিভাগের সম্পাদনা ও পরিবেশন স্টাইলের দিকটির নিয়মিত খোঁজখবর করেন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। আসলে, পত্রিকার এই গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভটি দিনে দিনে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। অনেক পাঠক আছেন, যাঁরা বিভিন্ন জাতীয় বা স্থানীয় ভিত্তিক সমস্যা সংকট ও তার সমাধানের উপায় সম্পর্কিত মতামত চিঠিপত্রের মাধ্যমে দিচ্ছেন।

যেমন একজনের কথা বলি, তিনি মাহবুবুল হক চৌধুরী, একজন ব্যাংকার ছিলেন, এখন ঢাকায় থাকেন। তাঁর চিঠি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে ছাপা হচ্ছে। এর চিঠিগুলো সুলিখিত, সংক্ষিপ্ত, তথ্য সমৃদ্ধ। আরো কজন নিয়মিত চিঠিপত্র লেখক আছেন। দু'দশক আগে সিনে সাপ্তাহিক চিত্রালীর পাতায় চিঠি লিখে গোটা দেশের চিত্রালী পাঠকদের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন ধাপ, রংপুর ঠিকানার বাচ্চু নামে একজন, যিনি পেশায় একজন কাঠমিস্ত্রী, চিঠিপত্র লিখে পাঠানোর জন্যে সে সময় মোটা টাকা ব্যয় করতেন তিনি।

গল্পকার হাসান বাঙালি একসময় করাচিতে চাকুরিরত থাকা অবস্থায় বহু চিঠি লিখতেন, পরে তিনি সৌমেন হাসান নামে কিছু চিঠি লিখেছেন। এগুলো তার ছদ্মনাম, আসল নাম হাসান ইউনুস, বর্তমানে 'রেডিও বাংলাদেশ' রাজশাহী কেন্দ্রের বার্তা নিয়ন্ত্রক।

www.pathagar.com

আজকের দেশ দুনিয়ার সাড়া জাগানো লেখিকা তসলিমা নাসরিন বহু বছর আগে ময়মনসিংহে থাকাকালে একটি সিনে সাপ্তাহিকীতে প্রায়শই চিঠিপত্র লিখতেন এবং সেগুলো ছাপা হতো।

এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে নিজের নামে চিঠি লিখতে রাজী নন আপনি। সেক্ষেত্রে ছদ্মনাম বা 'ভুক্তভোগী' জনৈক পাঠক এভাবে লিখতে পারেন, এভাবে কোন কোন পত্রিকায় তা ছাপবেও। কিন্তু এজন্যে চিঠির সাথে আলাদা করে বিষয় লিখে জানানো দরকার যে, নিরাপত্তাজনিত বা অন্য কোন কারণে আপনি আপনার নাম ঠিকানা ছাপাতে চান না। এক্ষেত্রে কিন্তু চিঠির সাথে আপনার আসল নাম ঠিকানা আলাদা করে লিখে জানাতে হবে। লিখিত থাকতে পারে যে, ছদ্মনামের আড়ালে আসলে আপনি আছেন, তা জানতে পারবেন না পাঠক বা চিঠির বিষয় সংশ্লিষ্ট আর কেউ।

অবশ্য আসল নামের আড়ালে একশ্রেণীর পত্র লেখক সম্পাদককে কিংবা চিঠিপত্র কলামের সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত সাংবাদিককে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে ফেলেন। মিথ্যা বা কারো সম্মানের হানি ঘটে এমন বিষয়ের ওপর চিঠি লিখে বেনামে পাঠানো হয়, তা ছাপা হলে প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ আসতে থাকে। সে প্রতিবাদও ছাপা হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের সাথে জড়িয়ে যার সম্পর্কে লেখা হয়েছে তিনি মনঃকষ্ট পান, একটি পত্রিকা সম্পর্কে তার বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। এ কারণে জনসমস্যা সম্পর্কিত চিঠিছাড়া কারো দুর্নীতি, অনিয়ম এসব নিয়ে লেখা চিঠি, বেনামীতে ছাপার ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

অনেক চিঠি আছে, যা ছাপা হয় না। এর নানা কারণ। কিন্তু চিঠি না ছাপলে পাঠকেরা কষ্ট পান, দিনের পর দিন পত্রিকা কিনে কিনে, কিংবা কারো পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে হয়রান হয়ে যান। কিন্তু জানতে পারেন না চিঠি ছাপা না হবার কারণটি। নানা কারণে চিঠি ছাপা হয় না আপনার। হতে পারে চিঠির বক্তব্য রাষ্ট্রীয় বা সংবাদপত্রের নীতিমালার পরিপন্থী, হতে পারে চিঠিটির বক্তব্য পরিষ্কার করে লিখতে পারেন নি, কিংবা হতে পারে চিঠিটি ডাক বিভাগের কল্যাণে সঠিক জায়গায় পৌঁছে নি। এমন হতে পারে যে, যে বিষয়টি নিয়ে লিখেছেন, তা পত্রিকায় ছাপানোর আদৌ প্রয়োজন নেই, কিংবা চিঠি ছাপা হলে সামাজিকভাবে কেউ হেয় প্রতিপন্ন হবেন, সেগুলো ফেলে দেয়া হয়, তবে তার আগে কোন কোন পত্রিকা আলাদা একটি কলামে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে লিখে জানিয়ে দেয় কি কারণে ঐ চিঠিখানি ছাপা হলো না, কিংবা বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্যে কোথায় কার কাছে যোগাযোগ করতে হবে।

চিঠিপত্র ছাড়াও, কোন কোন পত্রিকায় 'মতামত' কলাম রয়েছে। রয়েছে 'পাঠকের প্রতিক্রিয়া' 'আলোচনা' এ ধরনের কলাম। মূলত চিঠিপত্র কলামের জন্যে পাঠানো পাঠকের কোন কোন যুক্তিপূর্ণ এবং সুলিখিত চিঠি ঐসব শিরোনামে প্রকাশিত কলামে ছাপা হয়ে থাকে। এই কলামের সব লেখাই যে পাঠকদের চিঠি, তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে কলামিস্টও লেখেন আলোচনা কলামে। তবে 'পাঠকের প্রতিক্রিয়া' 'মতামত' এসব কলামে ভালো চিঠিপত্র, যার আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা ছাপা হয়ে থাকে। মনে করুন আপনার প্রিয় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ফারাক্কা সমস্যার ওপর একটি সম্পাদকীয়,

www.pathagar.com

উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ, চিঠিপত্র, কিংবা ছাপা হয়েছে একটি প্রতিবেদন। আপনার কাছে এই বিষয় সম্পর্কিত যদি কোন তথ্য-উপাত্ত থাকে, জনমত গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করেন, কিংবা প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিবরণ বা উপসম্পাদকীয় নিবন্ধের মন্তব্য সম্পর্কে আপনি দ্বিমত পোষণ করেন, লিখতে পারেন আলোচনা মতামত বা প্রতিক্রিয়া। পছন্দ হলে সেটি আলোচনা হিসেবে ছাপা হবে, কিংবা পাঠকের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ছাপা হবে, কিংবা ছাপা হবে চিঠিপত্র কলামে।

উপসম্পাদকীয় পাতা এবং তার পাশের পাতাটি, সেখানে ছাপা হচ্ছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের ওপর, তার রচনাগত পরিবেশন ভঙ্গি ও মেকআপে এসেছে নতুনত্ব। পাঠক এটা বেশ গ্রহণ করেছেন। সংবাদপত্র কর্মীদের এই যে নতুন উদ্যোগ তার কোনটা বিদেশী পত্রিকা থেকে নেয়া, কোনটা আবার মৌলিক সৃষ্টি। যেমন : চিঠিপত্র কলামে বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত কার্টুন দেয়াটা পুরাতন ব্যাপার, ভারতীয় বাংলা দৈনিকে দেখা গেছে কয়েক বছর আগেই। বিশেষ একটি বিষয় বাছাই করে তার আর টেলিফোনে নেয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের (বা কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠকদের) মন্তব্য নিয়ে ফিচার প্রকাশ বাংলাদেশের সংবাদপত্রে নতুন হলেও স্টাইলটি বাইরের দেশে পুরাতন। তবে, মৌলিক পরিবেশন হলো সম্পাদকীয় পাতায় এক কলাম জুড়ে 'একস্লিপ' ধরনের খবর কার্টুন সহ প্রকাশ করা এক পৃষ্ঠার জায়গায় ছ'পাতা নির্দিষ্ট করে একাধিক নিবন্ধ, ফিচার, চিঠিপত্র, চিঠিপত্রের ইনসেটে 'উনপত্র, গল্প কার্টুন, এসব দেয়া। বয়স্ক যারা সাংবাদিক পঞ্চাশ বা ষাটের দশক থেকে সংবাদপত্রে কর্মরত তাঁদের কেউ কেউ এগুলো পছন্দ করছেন না। কিন্তু নতুন প্রজন্মের পাঠকরা ইতোমধ্যে এগুলো গ্রহণ করেছেন। সমাজের আর সব ব্যাপার-বিষয়ের মতো সংবাদপত্রেও বিবর্তন আসবে, নতুন নতুন বিষয় আসবে, পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে, এটাই স্বাভাবিক।

আজকাল, সংবাদপত্র ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার দিনে মালিক যেমন চাইবেন আরো বেশি সার্কুলেশন, সম্পাদনার সাথে জড়িত সাংবাদিক কর্মীরাও চাইবেন তাদের মেধার সাক্ষর রাখতে নতুন সাংবাদিকতা ইন্ট্রিডিউস করতে। চাইবেন আরো বেশি সংখ্যক পাঠকের হাতে পত্রিকাটি যাক। দুপক্ষের এ উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

তবে হ্যাঁ, নতুন কিছু দেয়ার নামে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করার মতো লেখা 'নিবন্ধ' নামে ছাপা হচ্ছে কোন কোন পত্রিকায়। ছাপা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এমন সম্পাদকীয় বা উপসম্পাদকীয় মন্তব্য। ব্যবসায়িক ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দিয়ে অযথা চমক সৃষ্টির চেষ্টাও করছেন অসুস্থ কেউ কেউ। কিন্তু পাঠকরা এসব গ্রহণ করছেন না।

সম্পাদকীয় পাতায় নতুন পরিচালনার মধ্যে লক্ষ করা যায়, দেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নিবন্ধ প্রকাশ যা দুদশক আগেও তেমন চোখে পড়তো না। মুক্ত চিন্তা শিরোনামে ভোরের কাগজে প্রকাশিত নিবন্ধগুলো নতুন সংযোজন। 'সংবাদ' চালু করেছে মুক্ত আলোচনা পাতা যাতে পাঠকও অংশ নিতে পারেন। এটাও হাল সংযোজন। দৈনিক বাংলা সম্পাদকীয় পাতায় আইন বিষয়ক, স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ক লেখা প্রকাশ করেছে ক বছর আগে, তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্যাটায়ারধর্মী লেখা

www.pathagar.com

ছাপে খন্দকার আলী আশরাফের (দুর্জন উবাচ)। বাংলাবাজার পত্রিকায় 'জনতার মঞ্চ' 'উন্মুক্ত বিতর্ক' নতুন সংযোজন। আজকের কাগজে তিন চারটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ফিচার ও চিঠিপত্র ছাড়াও মাঝে মধ্যে প্রথম পাতায় সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপে। ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় পাতায় বহু বছর ধরেই চলছে সম্পাদকীয় উপসম্পাদকীয়, আর চিঠিপত্র ছাপানো, এতে নতুন সংযুক্তি লক্ষ করা যায় না। ইনকিলাব, সংগ্রাম, মিল্লাত একইভাবে পুরনো দিনের ডিসপ্লের পদ্ধতিতে সম্পাদকীয় উপসম্পাদকীয় চিঠিপত্র ছাপছে। আল মুজাদ্দেদ কিছুদিন থেকে বের হচ্ছে, রঙও এনেছে প্রথম ও শেষের পাতায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনেক, কিন্তু সম্পাদকীয় পাতায় নতুন সংযোজন বা পরিবেশনার স্টাইল আসে নি। দৈনিক জনতা আগের স্টাইলে সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ছাপছে, তবে হালে চিঠিপত্র কলামে একটি চিঠি বেছে নিয়ে বড় শিরোনাম দিচ্ছে। এই পাতায় বিজ্ঞান কণিকা, রোগ জিজ্ঞাসা, টোটকা চিকিৎসা, বাণী চিরন্তন, এসব তাদের নতুন সংযোজন। জনকণ্ঠ তাদের সম্পাদকীয় পাতার বিন্যাস ঘটিয়েছে ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ বা বাংলাবাজার পত্রিকায় মতো কলাম আকার পরিবর্তনে, তেমনি আবার দুটি সম্পাদকীয়—নিচে 'আহরণ' শিরোনামে বিদেশী পত্রিকা থেকে নেয়া উল্লেখযোগ্য সংবাদ অনুবাদ করে ছাপছে। একই পাতায় 'সম্পাদক সমীপে' এই চিঠিপত্র কলাম ছাড়াও দিচ্ছে বিদেশের (বিলেতের) চিঠি, আলোচনা নিবন্ধ, একই পাতায় যাচ্ছে পরামর্শ, বচন থেকে শুরু করে গাছ লাগানোর পদ্ধতি পর্যন্ত। এর পাশে ৫ এর পাতায় ফিচার, বিভিন্ন অনুবাদ রচনা ছাড়াও নিয়মিতভাবে কার্টুনসহ টুকরো গপ্‌পো ছাপছে। আগের দিনের পত্রিকায় সম্পাদকীয় পাতায় এসব চোখে পড়তো না।

সম্পাদকীয় পাতায় সাম্প্রতিক যে বিবর্তন, নতুন বিষয় সংযোজন, নতুন স্টাইলের ডিসপ্লে, এসবের পেছনে কাজ করছেন পুরাতন নতুন বহু সাংবাদিক। রচনায় নাম ছাপা হয় এমন ছাড়া আর কারো সম্পর্কে পাঠক অজ্ঞাত। অথচ একটি সম্পূর্ণ পত্রিকা নির্ভুল এবং সাজানো গোছানো অবস্থায় পাঠকদের হাতে পর্যন্ত পৌছানোর ব্যাপারে এদের থাকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তঘাম।

যারা রিপোর্টার, অফিসে তাদের অধিকাংশকেই দিনের ভাগে পাওয়া যায় না, কিন্তু বাঁধা সময় ধরে হাজির থাকেন সহকারী সম্পাদকগণ, সম্পাদকীয় পাতার সহকারীরা। কোন পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগের কাজ সকাল দশটায় শুরু হয়, কোথাও এগারোটায়। এরা অনেকে দুপুরে অফিসেই খাবার খান, অফিস ছাড়েন সন্ধ্যায় বা সন্ধ্যার পরেও। তবে এমনও কিছু পত্রিকা রয়েছে যেখানে সহকারী সম্পাদকগণ দুপুর বারোটা সাড়ে বারোটায় অফিসে এসে বসেন, লেখা শুরু করেন। তা-ই বলে সবাই যে সকালের শুরু ভাগটা বাসায় বসে থাকেন, তা নয়। কেউ বাসায় পত্রপত্রিকা পড়েন, আজ কি লিখবেন তার ওপর চিন্তা ভাবনা পাকিয়ে রাখেন, কেউ যেতে থাকেন আড্ডায়, আড্ডার আলাপেও দেশ দুনিয়ার ব্যাপার বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয় যা লেখার কাজে লাগে। কোন লাইব্রেরীতে রেফারেন্স ঘাটেন কেউ। আসলে অফিসে উপস্থিতি, সাজানো টেবিল চেয়ারে বসা, এর ওপর নির্ভর করে না সহকারী সম্পাদকদের কাজ।

www.pathagar.com

এমনও হতে পারে যে, একজন সহকারী সম্পাদক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে যাচ্ছেন কুমিল্লায়, বা খুলনায়, পথে যেতে যেতে মানুষজনের সাথে আলাপ হলো, কোন ঘটনা দেখলেন, পর্যবেক্ষণ করলেন ইন্টারেস্টিং কোন পরিস্থিতি। এ থেকে হয়ে যায় উপসম্পাদকীয় রচনা। মস্তিষ্কে বা কাগজে টুকে রাখেন ঘটনা, পরিস্থিতি, কথাবার্তা, ঢাকায় ফিরে তা-ই নিয়ে জমপেশ কিছু লিখে ফেলেন। ইত্তেফাকে এমনটি বেশি দেখা যায়, অন্যসব কাগজেও কিছু কিছু বের হয়। সাধারণত দেশের বিভিন্ন জেলা থানা এলাকার অবস্থান, প্রকৃতি, মানুষজন, তাদের সমস্যা সংকট, এসব পাওয়া যায় ঐসব উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে।

দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক নির্মল সেন (তিনি একজন বাম রাজনীতিকও) প্রায়শই ঢাকার বাইরে যান এবং সফর অভিজ্ঞতার ওপর নিবন্ধ লেখেন। কেবল কোন অনুষ্ঠানে নয়, কিংবা কোন সিডিউল প্রোগ্রামেও নয়, লেখার মশলা সংগ্রহের জন্যেও তিনি কখনো কখনো বিভিন্ন জনপদ ঘুরে বেড়ান।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি : নির্মল সেনকে দেখি উত্তরবঙ্গবাসী একটি ট্রেনের কামরায় উঠে বসেছেন কোন এক ছুটির দিনে। কোথায় যাবেন তিনি? না, নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই, যাবেন যতোদূর এই ট্রেনখানা যায়। ট্রেন গেল ঢাকা থেকে বাহাদুরাবাদ ঘাট, ঘাট পেরিয়ে সেই দিনাজপুর। নির্মল সেন দিনাজপুর পর্যন্ত গেলেন, ফিরতি টেনেই ঢাকায় ফিরে এলেন। পথিমধ্যে যা দেখলেন তিনি, লোকজনের সাথে কথা হলো যা যা, তাই নিয়ে লিখলেন পোস্ট।

. . . পাঠক, এতোক্ষণ যাকে বললাম উপসম্পাদকীয়, সংবাদপত্র কর্মীও সংশ্লিষ্টদের কাছে তা 'পোস্ট এডিটরিয়াল' বা আরো সংক্ষেপে 'পোস্ট'। এখানে পোস্ট মানে 'ডাক' নয়, স্তম্ভ . . .। কোন কোন সহকারী সম্পাদক আছেন, যারা ছুটিতে বাড়ি গিয়েও বসে থাকেন না, 'বহুদিন পরে গ্রামে গিয়ে যা দেখলেন' তাই নিয়ে লেখেন ঢাকা ফিরে এসে।

আজকাল উপসম্পাদকীয় কলামে অতিথি কলামটি কেবল নয়, কোন পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনও ছাপা হয়ে থাকে। সম্পাদকীয় পাতায় লেখা ছাপা হয় সহ-সম্পাদকের, বার্তা সম্পাদকও কখনো লিখেছেন বা লিখছেন।

প্রখ্যাত সাংবাদিক আব্দুল আওয়াল খান, সংবাদে বার্তা সম্পাদক থাকাকালে তিনি চারণ ছন্দনামে নিয়মিত পোস্ট লিখতেন।

এখন যারা কলামিস্ট হিসেবে বিভিন্ন দৈনিকে উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ বা পোস্ট লিখছেন নিয়মিত বা অনিয়মিত, তাদের মধ্যে আছেন : সংবাদে, জনকণ্ঠে, ভোরের কাগজে, আজকের কাগজে, বাংলাবাজার পত্রিকায়, দৈনিক বাংলায়, খবরে, বাংলার বাণীতে, ইনকিলাবে, সংগ্রামে, মিল্লাতে, জনতায়, দেশ জনতায়, দিনকালে, রূপালীতে, অবজারভারে, টাইমসে, ডেইলি স্টারে।

আগেই বলেছি; ক'বছর থেকে সম্পাদকীয় পাতায় যে ব্যাপক পরিবর্তনটি লক্ষণীয়, তারমধ্যে একটি হলো, প্রচুর সংখ্যক কলামিস্ট, যারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত, তাঁরা লিখছেন। নিজের পেশা পরিচয়ে লিখছেন। কেবল রাজনীতি নয়, আর্থ-

www.pathagar.com

সামাজিক অবস্থার চিত্র আগের চেয়ে অনেক বেশি আসছে লেখার বিষয় হয়ে। আসছে আন্তর্জাতিক বিষয়, আসছে গ্রাম।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, দেশের একটি অঞ্চলের জেলা থানা এলাকা থেকে যা দেখছি, তাতে, বিপুল সংখ্যক পাঠক সৃষ্টি হয়েছে ঢাকার বাইরে। অনেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বা লাইনকে লাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন ঐসব নিবন্ধ। এ নিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন। আগে, সম্পাদকীয় বা উপসম্পাদকীয় নিবন্ধের পাঠক সংখ্যা কম ছিল, এখন তা বেশ বেড়েছে, তারচেয়ে বড় বিষয় এটা যে, পাঠকের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে ঐ লেখাগুলো সম্পর্কে। চিঠিপত্র কলামে দেখা যায় : কিছুসংখ্যক পাঠক উপসম্পাদকীয় নিবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে তাদের মন্তব্য মতামত লিখছেন।

পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি, লেখা ও পরিবেশনাগত মান উন্নয়ন, লেখায় বিতর্কের সূচনা, অন্যদিকে পাঠকপক্ষে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি, পত্রিকার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি, এসব নানাবিধ কারণে সংবাদপত্রের এই স্তম্ভটির চাহিদা যেমন বেড়েছে, কিছু পাঠক তাদের মতামতও ছুঁড়ছেন। তবে, ব্যাপকভিত্তিক জনমত গড়ে ওঠার ব্যাপারটি খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। আজাদ-এ যেমন দেখা যেতো যে একটি সম্পাদকীয় বা উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে গায়ে আগুন জ্বলতো, ইত্তেফাকে মোসাফিরের (তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া) 'রাজনৈতিক মঞ্চ' তৎকালে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দিতো, কিন্তু এখন কি তা হচ্ছে? কিছু পাঠকের প্রতিক্রিয়া চিঠিপত্র কলামে লিখলেও ব্যাপক জনমত গড়ে উঠছে না, আবার সরকার কিংবা বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাজেসটিভ লেখাগুলোকে আমল দিচ্ছে না।

অন্যদিকে কোন কোন কলামিস্টের লেখায় আবার ব্যক্তিআক্রোশ আসছে, বিষয়-বক্তব্য নিয়ে পাঠকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় কিংবা পাঠক বিভ্রান্তিতে পড়েন এমন তথ্য নিয়েও লেখা উপসম্পাদকীয় ছাপা হয়। তবে অধিকাংশ লেখায় রুচিশীলতার ছোঁয়া মেলে, মেলে বস্তুনিষ্ঠতা, পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, মিঠেকড়া মন্তব্য।

কোন কোন পাঠক জানতে চান, এই যে মেলা মেলা উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাপা হচ্ছে রোজ, এগুলো সংগৃহীত হয় কি করে? টাকা পয়সা দেয়া হয় কি লেখাগুলোর জন্যে? কেমন? তাদের জন্যে বলি : লেখাগুলো পত্রিকা অফিসে আসে বিভিন্নভাবে। সহকারী সম্পাদক 'পোস্ট' লিখলে সেগুলো অফিসেই মেলে। তবে, অতিথি কলামিস্ট যারা, তাদের লেখা কেউ অফিসে নিজে বা বাহক মারফত পৌঁছে দিয়ে যান, কারো লেখা অফিস থেকে কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে নেয়া হয়। যেমন : সংবাদে লেখেন বিশিষ্ট ব্যাংকার (বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর) সৈয়দ আলী কবির, তিনি তাঁর লেখা নিয়ে হাজির হন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বজলুর রহমানের কাছে। আবার, এমনও আছেন যারা নিজেরা ফোন করেন 'লেখা তৈরি কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে যান।' কাউকে আবার এক বা একাধিকবার ফোন করতে হয় পোস্টের জন্যে। একেক কাগজে একেকজনের বেলায় একেক রকম নিয়ম লেখা সংগ্রহের ব্যাপারে।

ঢাকার বাইরে থেকে যারা লেখেন, যেমন ময়মনসিংহ থেকে যতীন সরকার, রাজশাহী থেকে অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরিয়ার সার্ভিস বা

www.pathagar.com

ডাকযোগে লেখা পাঠান। যেসব কাগজ দৈনিক তিনচারটি নিবন্ধ ছাপছে, তাদের আলাদা কর্মীও নিয়োগ করা আছে ঢাকার বিভিন্ন জনের কাছ থেকে নিবন্ধ সংগ্রহ করার জন্যে। একই পদ্ধতিতে সাপ্তাহিক কয়েকটি পত্রিকাতেও লেখা আনা হয়।

কলাম যারা লেখেন, কলামিস্ট হিসেবে পরিচিত, লেখা ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পান তারা, যাকে বলা হয় 'সম্মানী'। এই সম্মানী কথাটা আজো চালু রয়েছে, পুরাতন দিনের কারো আপত্তি নেই, কেবল একজন তরুণ সাংবাদিক (আমান-উদ-দৌলা) একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার কলামে 'সম্মানী নয়, ন্যায্য পাওনা চাই'—এরকম লিখে ঝাপটা হাওয়ার মতো ক্ষণিক আলোচনার পাত্র হয়েছিলেন।

না, যারা টাকা পান, সবাই সমান অঙ্কের টাকা পান না নিবন্ধ রচনার জন্যে। একেকটি নিবন্ধের জন্যে কেউ পান ২ শ টাকা, কেউ পান ৫ শ টাকা। খবরের কাগজে যারা নিবন্ধ লেখেন তারা পান আড়াই শ থেকে ৪-৫ শ। কোন কাগজে রিপোর্টার, সাব-এডিটর বা অন্যকোন কর্মীর নিবন্ধ সম্পাদকীয় পাতায় ছাপালে তার জন্যে আলাদা সম্মানী দেয়া হয়, কোন কাগজে এ থেকে বঞ্চিত করা হয়। কোন পত্রিকায় 'সম্মানী' দেয়া হয় নিয়মিত, মাসের পহেলা দিকে, কোন কাগজে কারো টাকা আবার বাকিও থাকে। মাসের পর মাস টাকা বাকি থাকে। কারোরটা পার্টলি পেমেন্ট করা হয়, কারোরটা শেষপর্যন্ত মার যায়।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখাটা, কেবল যে পাঠকদের পড়বার জন্যে লেখা হয়, তা কিন্তু সবক্ষেত্রে নয়। কোন লেখা ছাপা হলে পাঠক তো পড়েনই, কিন্তু নিবন্ধকারেরও উদ্দেশ্য থাকে। যেমন : পিএইচডি করবার জন্যে কিছু যোগ্যতা প্রয়োজন, যার মধ্যে একটি হলো এপর্যন্ত তার কতোটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একারণে কেউ 'নিজের কাজেই' নিবন্ধ লিখে পত্রিকার পাতায় ছাপানোর ব্যবস্থা করেন, এমনকি সম্পাদক বা সম্পাদকীয় পাতার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির দুয়ারে দুয়ারে ফেরেন। কেউ পত্রিকায় লেখেন তার আখেরে ভালর জন্যে, বলা যায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে। একজনকে জানি, যিনি সরকারের পক্ষে এবং বিরোধীদলের বিপক্ষে বহু কলাম লিখেছেন, সেগুলো পড়ে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি খুশি হন এবং ঐ কলাম লেখককে সরকারী উচ্চপদে চাকুরি দেয়া হয়। তবে এগুলো ব্যাপক-বিস্তৃত ঘটনা নয়, হাতে গোনা কারো কারো ক্ষেত্রে ঘটেছে।

অধিকাংশ কলামিস্ট দেশ সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি পাঠকের সামনে তুলে ধরে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। পাঠককে দিচ্ছেন তথ্য-উপাত্ত, জানাচ্ছেন ঘটনা, দিচ্ছেন তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। ঢাকা থেকে অনেক দূরের অঞ্চলে কাজ করেও, বিভিন্ন পত্রিকা পড়ে যা মনে হয়, তাতে, ধারণা হয়, এদেশের পত্রিকা, সম্পাদকীয় স্তম্ভ, উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখার মান, পরিবেশনগত চমৎকারিত্ব, নতুন বিষয় সংযুক্তি, এসবে আরো ব্যাপক পরিবর্তন আসবে।

বার্তা বিভাগে 'রিপোর্টিং' অংশের কথা পরে বলি, তার আগে সম্পাদনা বিভাগ সম্পর্কে। দৈনিক পত্রিকায় থাকেন একজন বার্তা সম্পাদক। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। বিভিন্ন বিভাগের অসংখ্য কর্মী তার নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু, সাধারণ পাঠক অনেকে এমন

www.pathagar.com

ধারণা পোষণ করেন যে একজন বার্তা সম্পাদক বুঝিবা পত্রিকায় ছাপা হয় এরকম সবগুলো সংবাদই সম্পাদনা করেন। তা তো নয় বরং অনেক সংবাদ ছাপা হবার আগে চোখ বুলিয়ে দেখাও সম্ভব হয় না অবস্থার নিরিখে। যেমন : পত্রিকায় ছাপা হয়েছে আপনার সংগঠনের একটি প্রেসবিজ্ঞপ্তি, কিংবা ছাপা হয়েছে বিদেশী কোন খবর, কিংবা ছাপা হয়েছে নীলফামারীতে আদার চাষ কমে যাচ্ছে, এগুলো, যদিও তা বার্তা, বার্তা সম্পাদক তা সম্পাদনা করেন না, এজন্যে বিভিন্ন বিভাগে আছে বিভিন্ন সম্পাদনা কর্মী। বিশেষ বিশেষ খবর, পত্রিকার পলিসি প্রশ্নের মুখোমুখি করে দেয় এমন খবর, প্রথম পাতায় ছাপা হবে এরকম সংবাদ তিনি সম্পাদনা করেন।

সব পত্রিকায় বার্তা সম্পাদকই যে কেবল বার্তা সম্পাদনা করেন, তা-ও কিন্তু নয়। নিয়মের রকমফের আছে। কোন কোন পত্রিকায় নির্বাহী সম্পাদকও খবর সম্পাদনা করেন, অস্থায়ী সম্পাদকও খবর সম্পাদনা করেন, আবার এমনও আছে যে উপদেষ্টা সম্পাদক, বা সম্পাদকও কোন কোন খবর সম্পাদনা করে থাকেন। এঁদের ক্ষেত্রে সম্পাদনা মানে খবরটি পড়া, কাটছাট করা, শিরোনাম দেয়া, এগুলো বোঝায় না, কোন্ খবরটি ছাপা হবে কিংবা হবে না তা নির্দেশ করেন এঁরা। এরা রিপোর্টারদের এ্যাসাইনমেন্টও দেন। পত্রিকার নীতিমালার সাথে পরিবেশিত খবরের ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিকগুলো লক্ষ রাখেন।

বার্তা সম্পাদক যিনি, তাঁর কাজটি, খবর সম্পাদনা করা ছাড়াও, বার্তা বিভাগের বিভিন্ন ছোট বড় বিভাগের মধ্যে সমন্বয় রাখা, কার্য তদারকি করা। তাকে চোখ রাখতে হয় রিপোর্টিং বিভাগ, অনুবাদ ও অনুলেখক বিভাগ, কার্যত মফস্বল বিভাগ, বড় বড় সিটি (যেমন : চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী মহানগরী), আলোকচিত্রী, আলোকচিত্র সম্পাদনা বিভাগ, অংকন বিভাগ, সংশোধনী বিভাগ, কম্পোজ বিভাগ, ছবি প্রসেসিং, এমনকি কয়টার মধ্যে ডামি তৈরি হবে, মেকআপ হবে, কোন্ কোন্ কাগজে কখন প্লেট তৈরি হবে, ছাপা হবে, মায় 'মেইল' ধরতে পারবে কিনা, সেগুলোও কড়া সতর্ক চোখে রাখতে হবে।

বার্তা বিভাগের কাজ শেষ হয় মধ্যরাতে, তারপর থেকে কাগজ ছাপানোর প্রক্রিয়া হয় শুরু। সেক্ষেত্রে, নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গণ্ডী কেবল বার্তা সম্পাদনা বা মেকআপ-এ সীমাবদ্ধ থাকে না, ছাপাখানায় প্লেট পড়লো কিনা, প্রেস চালু হলো কিনা, এসবও দেখেন কেউ কেউ। এটা ঠিক যে, কোন কোন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক পাতা সাজানো শেষ করে বাসায় চলে যান, কিন্তু এমনও কেউ কেউ আছেন যাঁদের দেখি প্রেস থেকে কেবলি ছাপা হয়ে বেরুনো গরম একখানা পত্রিকার কপি হাতে নিয়ে ফুটি ফুটি ভোরে অফিস ত্যাগ করেন। আসলে এটা নির্ভর করে একটি পত্রিকার লোকবল, কাজের ধারা, ঐ বার্তা সম্পাদকের মন-মানসিকতা, এসব নানা বিষয়ের ওপর।

বার্তা সম্পাদককে হতে হয় মেধাসম্পন্ন, ক্ষিপ্ত খ্যাতিসম্পন্ন, সিদ্ধান্ত নিতে হয় খুব দ্রুততার সাথে। এটাও অবশ্য নির্ভর করে সময়ের ওপর। একজন বার্তা সম্পাদক, দিনের ভাগে যখন তার টেবিলে বসেন, তিনি থাকতে পারেন হয়তো বা একটুখানি রিলাক্স। এসময় তিনি (দিনের ভাগে) বিভিন্ন পত্রিকা পড়ছেন, আয়েশে চা সিগারেট.

www.pathagar.com

খাচ্ছেন, বাইরের লোকজন এলে কথা বলতে পারছেন, মাঝে মধ্যে সহকর্মীদের সাথে চমৎকার আড্ডা হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময় ধরে মিটিং হচ্ছে সম্পাদকের সাথে, কিংবা পরিচালনা পক্ষের কারো সাথে, কিংবা রিপোর্টারদের সাথে। বিশেষ প্রতিবেদনের বিষয় কিংবা সে ব্যাপারে কাকে এ্যাসাইনমেন্ট দেয়া যায় তাও ভাবতে পারেন। এ সময় তিনি টেলিফোনে খবরও নিতে পারেন বাসায় যে, স্ত্রী আজ বিকেলে ডাক্তার দেখাতে যাবে কিনা, ছেলেটা স্কুলে গেছে খেয়ে না না খেয়ে এসব। এরই ফাঁকে তিনি আগের দিনের এক্সসেস আইটেমগুলো দেখে নেন। যদি মনে করেন বেঁচে যাওয়া আইটেম—(বার্তা) গুলো ভেতরের পাতায় ছাপা যাবে, ব'লে রেখে দেন, আবার কোনটা বাসি হয়ে গেছে বিবেচনা করলে ট্রেসিং ফেলে দেন। এই সময়ে বিশেষ কিছু স্টোরি সম্পাদনা করার সময় পান তিনি। সেগুলো পড়ে দেখেন, প্রয়োজনে কাটছাট করে, ঠাণ্ডামাথায় শিরোনাম দেন, পাঠানোর ব্যবস্থা করেন কম্পোজ সেকশনে। এসময় দৃশ্যত একটা ঢিলেঢালা ভাব থাকে। কিন্তু রাতের বেলা, আটটার পর থেকে পেজ মেকআপ হবার আগে পর্যন্ত থাকতে হয় তাকে কাজের প্রচণ্ড চাপে। দারুণ এক টেনশন। এমন একটা অবস্থা যে, দম নেবার ফুরসৎ পান না তিনি। এসময়টা খুব ক্ষিপ্রতার সাথে কাজ করতে হয় একটানা অনেকক্ষণ। মেল ধরানোর ব্যাপারটি নিয়ে থাকে টেনশন।

এই 'পিক আওয়ারে' তাকে রিপোর্টারদের দেয়া বিশেষ স্টোরি দেখতে হয়, এ্যাসাইনমেন্ট দেয়া স্টোরি দেখতে হয়, ঢাকার বাইরে থেকে ফ্যাক্সে ফোনে বা প্যাকেটে যেসব স্টোরী আসে, সেগুলো দেখতে হয়, ছাপা না ছাপার সিদ্ধান্ত নিতে হয়, ছাপলে, দেন তিনি পছন্দ সই শিরোনাম। তারপর তা কম্পোজে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে যে খবর আসে, সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো, দেখে নেন তিনি। শিরোনাম দেন। দেশের কোনো জেলা থানায় বড় কোন ঘটনা ঘটলে সে খবরটি এসে পৌছালো কি-না, খবরটি সম্পূর্ণ কি-না, ঘটনা পরবর্তী 'ডেভলপমেন্ট' আছে কি-না, ছবি এসেছে কি-না। ঢাকার আলোকচিত্রীদের মধ্যে কার কি এ্যাসাইনমেন্ট ছিল, বিশেষ ছবি তুলে এসেছে কি-না, কেউ—এসব শতেক কাজে শ' শ' ব্যস্ত তিনি, তার ফাঁকেও মাথায় ছক আঁকেন কোন খবরটি হবে আজকের প্রধান শিরোনাম, কোন স্টোরী বা ছবির ডিসপ্লে কেমন হবে। মস্তিষ্কে করে রাখা এই পরিকল্পনা কাগজে নকশা আঁকেন তিনি এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা থেকে। পরে সে অনুযায়ী 'ডামি' তৈরি হয়। এই 'ডামি'র ওপর নির্ভর করে পত্রিকার প্রথম পাতাটি দেখতে কেমন হবে, পাঠক আকর্ষণীয় হবে কতোটা।

এজন্যে, একটি খবরের আকার, প্রথম পাতায় কতোটুকু জায়গা নেবে, ডান পাতায় 'জাম্প' হবে, শিরোনামে কোন পয়েন্টের টাইপ দিলে ভালো, ছবি যাবে কয় কলাম জুড়ে, সবকিছুই লক্ষ রাখতে হয় তাকে। তাকে পরের দিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত এ্যাসাইনমেন্টও দিতে হয় রিপোর্টারদের বা ফটোগ্রাফারদের।

তবে, বার্তা সম্পাদকের কাজের আবার প্রকারভেদও আছে কাগজ এবং তার লোকবল বিশেষে। এমন দৈনিক আছে, যেখানে আছেন নগর সম্পাদক (সিটি এডিটর)। রিপোর্টারদের এ্যাসাইনমেন্ট দেয়া, রিপোর্ট (স্টোরি) এলে সেগুলো সম্পাদনা

www.pathagar.com

করা এমনকি শিরোনাম দিয়ে কম্পোজে পাঠিয়ে দেন তিনি। এগুলো বার্তা সম্পাদকের না দেখলেও চলে। এটা নির্ভর করে নগর সম্পাদকের দক্ষতা, নগর সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকের পারস্পরিক সম্পর্ক বা বিশ্বাসের ওপর। এই অবস্থায় বার্তা সম্পাদকের ওপর কাজের চাপ কমে। কোন কাগজে, বার্তা সম্পাদক নন, 'ডামি' তৈরি করেন চীফ সাব এডিটর। কোন কাগজে যুগ্ম বার্তা সম্পাদক থাকেন, তিনি কিছু খবর সম্পাদনা করেন কিংবা ডামি তৈরি করেন। সেক্ষেত্রেও চাপ কমে। কোন কাগজে বার্তা সম্পাদক, যুগ্ম বার্তা সম্পাদক, চীফ সাব এডিটর এবং শীফট ইনচার্জ পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন কোন্ খবরটি প্রধান শিরোনাম করা যাবে, কোন্ ছবি কোথায় কিভাবে বসবে, তারপর ছোট কাগজে আঁকা হয় ডামির নকশা, 'ডামি' তৈরি হয়।

কোন কোন পত্রিকায় এই 'ডামি'র ব্যাপারটি এতোই গুরুত্ব দেয়া হয় যে, ওটি তৈরির সময় নির্বাহী সম্পাদক, উপদেষ্টা সম্পাদক এমনকি সম্পাদক পর্যন্ত পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। তবে সবদিন সবসময় নয়। অনেকক্ষেত্রে ঘটনা, পরিস্থিতি, এর ওপর নির্ভর করে ব্যাপারটি। মনে করুন ঐদিন দেশ দুনিয়ায় এমন এক ঘটনা ঘটেছে যা পরদিন সকাল বেলা কাঁপিয়ে দেবে দেশ, হয়তোবা রাজনৈতিক উত্থান-পতন হয়েছে, ঝড় বন্যা ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে, এধরনের অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর— সময়ে এমন হয় যে, সম্পাদক সাহেব পর্যন্ত গভীর রাতে হাজির হন অফিসে, কিভাবে কতোটা খবর- ছবি যাচ্ছে খবর নেন, ডামি তৈরি দেখেন, প্রয়োজন হলে কিছু পরামর্শও দেন।

বার্তা সম্পাদককে কেবল বার্তা সম্পাদনা বা সংশ্লিষ্ট কাজই করতে হয় না, বার্তা কক্ষের আর সব উপ-বিভাগের (অবশ্য উপ-বিভাগ কথাটা বলা হয় না) সমস্যা অভিযোগ শুনতে হয়, কেউ ছুটির দরখাস্ত করলে তার সুপারিশ করতে হয়, রিপোর্টারদের বিভিন্ন বিলে সুপারিশ করতে হয়, বার্তা বিভাগের জন্যে লেখার কাগজ বা কলম আনতে হবে স্টোর থেকে তারও ইনডেন্ট লিখে দিতে হয়। ছাপা হবে কিংবা ছাপা হয়ে গেছে এমন কোন খবরের ব্যাপারে একদিকে মালিক পক্ষ-সম্পাদক, রিপোর্টার, অন্যদিকে ঐ খবর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ (লিয়াজোঁ) রক্ষার ব্যাপারটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যেমন ধরুন, সম্পাদক সাহেব টেলিফোনে নির্দেশ দিলেন বিশেষ কোন বিষয় বা ঘটনার ওপর একটা প্রতিবেদন লেখানোর জন্যে, এবং ঘটনা সংশ্লিষ্ট দু'ব্যক্তিকে অফিসে পাঠিয়ে দিলেন। বার্তা সম্পাদক তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ স্থাপন করলেন কোন এক রিপোর্টারের সাথে, তাকে অফিসে ডেকে আনালেন এবং সম্পাদক প্রেরিত ঐ দু'ব্যক্তির সাথে আলাপ করিয়ে দিলেন, জানিয়ে দিলেন কিভাবে কি রিপোর্ট লিখতে হবে।

আবার, এমনও হয় যে, মনে করুন কোন কর্পোরেশনের দুর্নীতির অভিযোগ ছাপা হয়েছে পত্রিকায়, কর্পোরেশন এখন তার প্রতিবাদ করবে। এই প্রতিবাদ সরাসরি বার্তা সম্পাদকের হাতে চলে আসতে পারে আবার হাত ঘুরেও আসতে পারে। প্রতিবাদটির ব্যাপারে রিপোর্টারের বক্তব্য নেয়ার প্রয়োজন হলে. স্বাভাবিকভাবেই বার্তা সম্পাদককে

www.pathagar.com

একাধিক পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। একাধিক পক্ষের যোগাযোগ ঘটে যদি কোন খবরের সূত্র নিয়ে কোন ব্যক্তি সরাসরি বার্তা সম্পাদকের সাথে দেখা করেন। ধরুন ঐ ব্যক্তি কিছু কাগজপত্র নিয়ে এলেন যা খুব জটিল বিষয়ের, পত্রিকার নীতিমালা অনুযায়ী তা ছাপা যাবে কি-না সন্দেহ আছে, সেক্ষেত্রে বার্তা সম্পাদককে মালিকপক্ষ বা সম্পাদক সাহেবের সাথে কথা বলে নিতে হয়, খবরটি ছাপার ব্যাপারে তাদের আপত্তি না থাকলে ঐ ব্যক্তির সাথে কোন রিপোর্টারের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে হয়।

এ ধরনের কাজগুলো ছাড়াও তাকে লক্ষ রাখতে হয় কোন কাগজে কি কি প্রতিবেদন ছাপা হলো, নিজের কাগজ তা 'মিস' করছে কিনা, একই আইটেম দুবার ছাপা হয়ে গেছে কি-না, কারো লেখায় কোন ভুল থেকে গেছে কি-না। মারাত্মক কোন বানান ভুল হয়ে গেছে, কৈফিয়ত তলব করতে হয় রিডারকে, কিংবা কম্পোজ কর্মীকে, কিংবা রিপোর্টারকে। এজন্যে চিঠি লেখা, কম্পোজ করিয়ে নেয়া, সই স্বাক্ষর দিয়ে পত্রটি জারী করা, এসবও করতে হয়। তবে কোন কোন কাগজে এই কাজটি করে থাকেন নির্বাহী সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, এঁরা। অর্থাৎ কাগজ ভেদে বার্তা সম্পাদকের কাজের ধারা, দায়দায়িত্ব, একেক রকম।

বার্তা সম্পাদককে খুব কাছাকাছি থেকে যারা কাজে সাহায্য করে থাকেন, তারা হলেন যুগ্ম বার্তা সম্পাদক, সিটি এডিটর, চীফ রিপোর্টার, চীফ সাব এডিটর, শীফট ইনচার্জ, ফিচার এডিটর, ফটো এডিটর বা চীফ ফটোগ্রাফার, মফস্বল বিভাগীয় সম্পাদক। কাগজ ভেদে কাজের 'সিস্টেম' একেকরকম। যেমন, কোন কাগজে প্রকাশিত ফিচারগুলো সম্পাদনা করেন ফিচার এডিটর, তিনি কম্পোজে পাঠান, পাতা ডামি করেন। কোন কাগজে আবার ফিচার সম্পাদনা করেন বার্তা সম্পাদকই। মফস্বল বিভাগ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত সংবাদকর্মীদের প্রতিবেদন সম্পাদনা করা হয়, সেখান থেকেই সরাসরি কম্পোজে দেয়া হয়, পাতার ডামি তৈরি হয়। তবে, বার্তা সম্পাদক কখনো কখনো এ পাতাগুলো চোখ বুলিয়ে দেখেন, প্রয়োজন হলে পরামর্শও দেন।

তবে এমন কেউ আছেন, সরাসরি বার্তা সম্পাদককেই দিতে হয় তাদের কাজটি। যেমন চীফ ফটোগ্রাফার, তিনি তার নিজের বা অপর সহকর্মীদের তোলা ছবি, যেগুলো ঐদিনের বার্তা-সংশ্লিষ্ট, প্রসেস করার পর বার্তা সম্পাদককে দেন, বাছাই পছন্দ করার পর ছবির আরেক প্রসেস বিভাগে পজেটিভ তৈরির জন্যে পাঠানো হয় তা। চীফ রিপোর্টার তার সহকর্মীদের স্টোরিগুলো জড়ো করেন, পড়েন, প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন, তারপর বার্তা সম্পাদকের কাছে পাঠান। বার্তা সম্পাদক নিজে, বা যুগ্ম বার্তা সম্পাদক বা কোন কোন ক্ষেত্রে চীফ সাব এডিটর সেগুলো প্রয়োজনে পুনঃ সম্পাদনা করেন, শিরোনাম দেন, কম্পোজ বিভাগে পাঠান, এভাবেই কাজ এগিয়ে চলে।

কোন দৈনিক পত্রিকা অফিসে ঢুকলে দেখবেন, লম্বা-চৌকোণা টেবিল, কিংবা ডিম্বাকৃতির টেবিল, ছড়ানো ছিটানো কাগজ, কাজ করে যাচ্ছেন কয়েকজন, এদের মধ্যে এক বা একাধিক মহিলাও আছেন। এঁরা সাব এডিটর। বাংলায় বলে সহ সম্পাদক। অজ্ঞাত অনেকে এই সহ সম্পাদক পদটির সাথে পূর্ব আলোচিত সহকারী সম্পাদকের পদটিকে গুলিয়ে ফেলেন। সহকারী সম্পাদক হলেন এ্যাসিসটেন্ট এডিটর, তাঁরা

www.pathagar.com

সাধারণত সম্পাদকীয় বা উপসম্পাদকীয় লেখেন, কেউ কেউ বিশেষ পাতা সম্পাদনা করেন। আর, এই পর্যায়ে আলোচিত সহ সম্পাদকগণ কাজ করেন ভিন্ন ভিন্নভাবে। কারো কারো সাধারণ ধারণা এরকম যে, বিদেশী খবরাখবরগুলো, যেগুলো কোন সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে টেলিপ্রিন্টারে আসে, কেবল অনুবাদ করেন সাব এডিটররা। তাদের আরো নানা কাজ করতে হয়।

সাব এডিটরদের এই টেবিল, পত্রিকায় যাকে বলা হয়, 'সাবিং ডেস্ক' সেটি স্বল্প পর্যায় থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন শীফট ইনচার্জ। সাবিং ডেস্ক একটি পত্রিকার জন্যে যেমন গুরুত্বপূর্ণ কর্ম অংশ, তেমনি শীফট ইনচার্জ পদটিও গুরু দায়িত্বের।

কোন পত্রিকায় রয়েছে দুটি শীফট, কোন পত্রিকায় তিনটি। একেক শীফটে ছ' ঘণ্টা কাজ হয়। একটি পত্রিকার কথা বলি, সেখানে প্রথম শীফট শুরু হয় সকাল এগারোটায়, চলে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। পরের শীফট ছটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। আরেক কাগজে সকাল আটটা-দু'টা, দু'টা-আটটা ও রাত আটটা-গভীররাত পর্যন্ত এই তিনটি শীফট চলে 'সাবিং-ডেস্ক'-এ। তা, দুটি হোক কিংবা তিনটি, একেকটি শীফটে থাকেন একজন শীফট ইনচার্জ।

আদর্শ কাঠামোয় ইনি সাব এডিটরদের মধ্যে চাকরির পদমর্যাদাগতভাবে সিনিয়র একজন। শীফট ইনচার্জ, কর্মনিয়ন্ত্রণ করেন ছয় থেকে আটজনের, তবে কোন কোন পত্রিকায় চার পাঁচজন কিংবা এখন তারও কম সংখ্যক সাব এডিটর নিয়ে শীফট পরিচালিত হয়। রিপোর্টাররা দিনের ভাগে সাধারণত এ্যাসাইনমেন্টে বা খবরের সন্ধানে বাইরে থাকেন, কিন্তু অফিসে গেলে কর্মব্যস্ত সাব এডিটরদের মেলে।

একটি শীফটে কিভাবে কাজ হয়? শিফট ইনচার্জ বাছাই করে দেশীবিদেশী সংবাদ সংস্থা থেকে পাওয়া বার্তাগুলো। এখানে তার সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যেগুলো খবর ছাপার যোগ্য মনে করেন (কখনো বার্তা সম্পাদক বা চীফ সাব এডিটরের সাথে আলাপ পরামর্শ করে নেন) সে খবর তুলে দেন কোন সাব এডিটরের হাতে। বাংলা কাগজ হলে তা বাংলায় অনুবাদ হয়, আবার ইংরেজি কাগজ হলে কেবল করা হয় প্রয়োজনীয় কাটছাঁট।

বাংলা কাগজের কথাই বলি : শিফট ইনচার্জ যে বার্তাটি দিলেন সাব এডিটরকে, তিনি তা অনুবাদ করেন, তারপর ফিরিয়ে দেন শীফট ইনচার্জের হাতে। শীফট ইনচার্জ তা পড়ে দেখেন, প্রয়োজন হলে সংশোধন করেন, পছন্দ সই শিরোনাম দেন, কয় কলাম শিরোনামে খবরটি ছাপা হবে তা 'মার্ক' করেন, টাইপ কতো পয়েন্টে হবে তা উল্লেখ করেন, তারপর পাঠিয়ে দেন কম্পোজ বিভাগে। এই যে পাঠানো, তারও পদ্ধতি আছে, খাতায় 'এন্ট্রি' করে পাঠানো হয়। একসাথে যায় পাঁচ সাত দশটা আইটেম। পিওন কম্পোজ বিভাগে দিয়ে আসে ঐ পাতা, কিংবা কখনো ডেস্ক থেকে উঠে গিয়েই দিয়ে আসেন কেউ। খাতা থেকে তুলে নেন 'কপি' কম্পোজ বিভাগের কেউ। হ্যাঁ এই 'কপি' কথাটাই চালু। কপিগুলো বুঝে নেয়ার সাথে সাথে কম্পোজ বিভাগ থেকে ঐ খাতায় লিখে দেয়া হয় এই দফায় প্রেরিত কপিগুলো কম্পোজ করলে তা কতো কলাম-ইঞ্চি হবে। এতে সুবিধা হলো যে, ঐ পাতার জন্যে (বিদেশের খবরের পাতা) পরবর্তীকালে আরো কতোটা কপি প্রয়োজন হবে। এই মাপ মাথায় রেখে সাবিং ডেস্কের কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

শীফট ইনচার্জ হন এমন মেধাসম্পন্ন যে তিনি বোঝেন সংবাদসংস্থার মাধ্যমে আসা কোন্ দেশী বিদেশী খবরটি প্রথম পাতায় যাবার মতো। সেটি রেখে দেন তিনি 'ফাস্ট ফাইলে', রাতের শীফটের জন্যে কিংবা উপস্থিত বার্তা সম্পাদক বা চীফ সাব এডিটরের সাথে কথা বলে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা নেন। যদি তিনি দেখেন যে, কোন খবর ছাপার প্রয়োজন নেই, ফেলে দেন তা। তিনি খবরের শিরোনাম দেন, কখনো দেন সাব এডিটর নিজেই। এটা নির্ভর করে খবরটির ধরন, যিনি সাব এডিটর তার শিরোনাম লেখার দক্ষতা, তার ওপর। এভাবে, বিদেশী খবর ছাপা হয় এমন পাতাটির কাজ শেষ হলে, শীফটের শেষ দিকে শীফট ইনচার্জ তৈরি করেন ঐ পাতার একটি নক্শা ছক।

কোন কোন কাগজে পরিপূর্ণ ডামিও তৈরি হয়। অবশ্য, এরকম ভাববেন না যে, দিনের শীফটে ডামি তৈরি হলেই খবরগুলো ছাপা হবে। পরিস্থিতি ভেদে ছাপা নাও হতে পারে। এমন হতে পারে যে, বিকেলে দেখা গেল, যে পাতাটায় বিদেশী খবর ছাপা হয় (ধরুন ৩ এর পাতা) তাতে এলো পূর্ণপাতা এক বিজ্ঞাপন। সেক্ষেত্রে খবরগুলো আর ছাপা হয় না। পূর্ণপাতা নয়, দুতিন কলাম বিজ্ঞাপন এসে পড়লেও প্রচুর খবর বাদ পড়ে যায়। আদর্শ পত্রিকায় অবশ্য, এমন আছে যে, আগেই বিজ্ঞাপন বিভাগ থেকে জানিয়ে দেয়া হয় ৩ এর পাতায় বিজ্ঞাপন কতো কলাম যাবে। তখন সেভাবেই বিদেশী বার্তা অনুবাদ, সম্পাদনার কাজ চলে।

এদেশের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের প্রাপ্তি চিত্রটি এমনি যে, তাতে মালিকপক্ষ কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না, সাব এডিটরদের কাজের ওপরও তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। এমন আছে যাতে বিদেশী সংবাদ ছাপা হয় এমন পাতাটি জুড়েই বিজ্ঞাপন থাকে সপ্তাহের অধিকাংশ দিন। সেক্ষেত্রে সাব এডিটরদের অনুবাদ কর্ম কম। আবার এমন পত্রিকা আছে যার বিদেশ সংবাদ পাতায় হয়তোবা এক ইঞ্চিও বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে না, সে কারণে সাব এডিটরদের ৮ কলামের জন্যে কপি তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ তাদের লিখে যেতে হয় পাতার পর পাতা, একটানা, অবসর মেলে খুব সামান্যই।

কপি তৈরি, অর্থাৎ ঐ অনুবাদ, সে কাজটি কিন্তু খুব সহজ নয়। মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয় ইংরেজিতে লেখা খবরটি, জটিল শব্দ হলে তার বাংলা অর্থ, বানান, এসব জানতে হয় তাকে। দেশ বা অঞ্চলের নাম, খবর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম, ঘটনার গুরুত্ব, কোন্ খবরটি কিভাবে পরিবেশন করলে পাঠকের মনোগ্রাহী হবে, এসবও জানতে বা বুঝতে হয়। এমনও খবর আসে যা অনুবাদে একটুখানি উনিশ-বিশ হলে খবরটি হয়ে যেতে পারে বিকৃত, হতে পারে তথ্য বিভ্রাট, পাঠকের কাছে উপহাসের ব্যাপার। এসব দিক লক্ষ রাখতে হয় একজন সাব এডিটরকে।

অনুবাদের হেরফেরে এদেশের সংবাদপত্রে নানা প্রহসন গল্প তৈরি হয়েছে যার সবগুলোই নিছক গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। 'পুলিশ ওয়াজ পেট্রলিং ইন দ্য সিটি স্ট্রিট'-এ ধরনের বাক্যের অনুবাদ হয়েছিল 'পুলিশ শহরের রাস্তায় পেট্রোল ছিটাইতেছিল।' এটা পুরাতন দিনের ঘটনা, কিন্তু প্রযুক্তি সংযুক্ত আধুনিক সংবাদপত্রের যুগেও এমনটি হচ্ছে। এগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ধরা যেতে পারে।

www.pathagar.com

প্রকৃত অবস্থা হলো : নির্ভুল চমৎকার আকর্ষণীয় অনুবাদ কর্ম আগেও হয়েছে, এখনো হচ্ছে। বিদেশী সংবাদ অনুবাদ, তা সাধারণ অনুবাদের মতো নয়, অনেকক্ষেত্রে হচ্ছে সহজ সরল ভাষায়, হচ্ছে ঘটনার ভাবানুবাদ, হচ্ছে ঐ সংবাদের প্রয়োজনীয় অংশটুকুর অনুবাদ। কোন কোন পত্রিকায় আবার সাব এডিটরকে দিয়ে কেবল সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে আসা খবর অনুবাদ করানো হয় না, বার্তা সম্পাদক (কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পাদক বা উপদেষ্টা সম্পাদকের নির্দেশে) বিদেশী পত্রিকার বিশেষ কোন লেখা, ফিচার, এসব অনুবাদ করিয়ে নেন, তা বিদেশী সংবাদের পাতায় বা ফিচার পাতায় ছাপাও হয়। অনেক বিদেশী নিবন্ধ বা ফিচারের শেষে দেখবেন, লেখা আছে, 'নিউজ উইক অবলম্বনে' কিংবা লেখা আছে 'আই এইচ টি'। তার মানে ঐ নিবন্ধ বা ফিচার নিউজ উইকে প্রকাশিত কোন লেখার অনুবাদ, কিংবা ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন (আইএইচটি) থেকে নিয়ে বাংলা অনুবাদ (কোন কোন ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ) করা হয়েছে।

'আজাদ' আমলে এমনকি তার পরেও, সাধারণত বিদেশী সংবাদের জন্যে নির্দিষ্ট পাতায় বিদেশী নিবন্ধ ফিচার ছাপা হতো, এখন তা কোন কোন কাগজে সম্পাদকীয় পাতার একাংশে ছাপা হচ্ছে। সাপ্তাহিক ফিচার পাতাতেও ছাপা হচ্ছে।

সাব এডিটর যারা, সাংবাদিক হিসেবে পত্রিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের কর্মী, এদের সিনিয়রিটি জুনিয়রিটি আছে, এরা ওয়েজ বোর্ডের গ্রেড অনুযায়ী বেতন পান, কিন্তু পাঠকদের কাছে এরা তেমন পরিচিত নন, যেমন পরিচিত প্রায়শই নাম ছাপা হয় এমন একজন রিপোর্টার। সাব এডিটরদের কাজ কঠিন হলেও থাকেন তারা 'অজ্ঞাত মানুষ' হিসেবে। এমন উদাহরণ আছে যে, প্রেস রিলিজ থেকে তথ্য নিয়ে নামে স্টোরি ছাপা হয় কোন স্টাফ রিপোর্টারের, কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশের বিরাট বিশাল সংবাদ, যা প্রধান শিরোনাম হিসেবে ছাপা হলো, লাখো পাঠক গিলে গিলে পড়লেন, তা কোন সাংবাদিকটির হাতে অনুবাদ হয়েছে, তা জানতে পারেন না কেউ। অবশ্য, আজকাল বিদেশী পত্রিকা থেকে অনুবাদ করা বা তথ্য-উপাত্ত অবলম্বনে লেখা নিবন্ধ বা ফিচারগুলো কোন কোন কাগজে সাব এডিটরের নামে ছাপা হচ্ছে।

সাব এডিটরের কাজ কেবল অনুবাদ করা নয়, আরো আছে। কাগজ ভেদে বিভিন্ন কাজ করতে হয় তাদের। যেমন : সাব এডিটরদের সাধারণত রাতের পালার কোন একজন বিবিসি শোনেন, ভোয়া শোনেন, বিটিভির খবর শোনেন, কেউ তা টেপ রেকর্ড করে নেন, পরে প্রয়োজনীয় খবর (এক বা একাধিক) লেখেন শীফট ইনচার্জ বা চীফ সাব এডিটরের নির্দেশ অনুযায়ী। কোন কাগজে (যেমন : ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ) ছাপা হয় বিদেশী বেতার থেকে প্রচারিত সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ সার অংশ। আজকের কাগজে 'ইথার থেকে' চালু করা হয়, আজ আরো কটি কাগজে তা চলছে। একাজটি করেন সাব এডিটর।

কিছু কাগজে প্রেস রিলিজগুলো সম্পাদনা করার জন্যে পৃথক সংবাদকর্মী আছে, তবে কিছু কাগজে আবার ঐ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সাব এডিটর করেন। কেউ খবরের গ্রন্থনা করেন। যেমন, দেশব্যাপী হরতাল হচ্ছে, বিভিন্ন জেলা, থানা থেকে ফোনে-ফ্যাক্সে আসছে খবর, সেগুলো বাছাই সম্পাদনা, একীকরণ ও সংক্ষিপ্ত একটা গড়-ইন্ট্রো লিখে পরিপূর্ণ রিপোর্ট তৈরি করেন। একটি পত্রিকায়, সাবিং ডেস্ক থেকে আবহাওয়া দফতরে ফোনে যোগাযোগ করে ঐদিনের আবহাওয়া বার্তা নেয়া হয়, লেখা হয় তা।

www.pathagar.com

'ভেতরের পাতায় কি আছে' এই কলামটিও লেখেন কোন সাব এডিটর কিংবা শীফট ইনচার্জ নিজেই। দিনের ভাগে, বিদেশী পাতার কাজ যখন করা হয়, তখন ঐ পাতার জন্যে লাগে এক বা একাধিক ছবি। ছবি বাছাই করেন সাধারণত শীফট ইনচার্জ, তিনি সময় হাতে থাকলে ক্যাপশন লিখেন, কিংবা ঐ ক্যাপশন লেখেন সাব এডিটর। অনেক কাগজে, যেখানে দেশের বিভিন্ন জেলা থানা থেকে প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর রিসিভ করবার পৃথক কোন কর্মী নেই, সেখানে সাব এডিটর ঐ টেলিফোন বার্তা লিখে নেন। সহজ মনে হলেও এটা দুরূহ কাজ, নিজে না করলে বোঝা যায় না। এমনিতে সাব এডিটর কমতি, তার ওপর আরেকটা কপি লিখছেন, এই সময়ে টেলিফোনে অনেক দূরের কণ্ঠস্বর। লিখতে হয় দ্রুত, পাতার পর পাতা। একটা শব্দ লাইন কিংবা পরিসংখ্যান কিছু ভুল হলে খবরটি নিয়ে তোলপাড় হবে, পাঠকের কাছে পত্রিকার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।

এখন কয়েকটি পত্রিকায় পৃথক কোন কর্মী বাইরের খবর রিসিভ করেন, কিন্তু আজো এ পরিস্থিতি রয়েছে যে লোকবল কম অথচ কাজের চাপ বেশি এমন পত্রিকায় শীফট ইনচার্জ এমনকি চীফ সাব এডিটরকেও খবর লিখে নিতে হয়। ঢাকার বাইরের খবর রিসিভ করা হয় টেপ রেকর্ডারে, কোন কোন পত্রিকায়, এগুলো পরে শুনে শুনে লিখতে হয় সাব এডিটরকে। কোন কোন কাগজে অবশ্য সাব এডিটরকে বলা হয় সম্পাদনা সহকারী।

এই সাব এডিটর বা সম্পাদনা সহকারীদের কেউ আবার মফস্বল বিভাগের বার্তা সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত। যেমন সংবাদ এর মফস্বল বিভাগের প্রধান হলেন কার্তিক চ্যাটার্জী। ইনি একজন সিনিয়র সাব এডিটর। এঁর সহকারী যিনি তিনিও একজন সাব এডিটর। ভোরের কাগজের এই দেশ পাতাটি সম্পাদনা করেন লতিফ সিদ্দিকী, ইনি একজন সাব এডিটর। এরা যে কেবল দেশের বিভিন্ন জেলা থানা থেকে আসা সংবাদগুলো সম্পাদনা করেন, তা নয়, পুরাতন প্রথাটি ভেঙ্গে এরা প্রতিবেদনও লেখেন যা প্রথম পাতায় বা ভেতরের পাতায় ছাপা হয়। যেমন কার্তিক চ্যাটার্জী ঢাকায় বা ছুটিতে ঢাকার বাইরে গেলে খবর লেখেন রেলওয়ের ব্যবস্থাপনা ত্রুটির ওপর, এরকম বেশ কয়েকটি সংবাদের প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। ভোরের কাগজের লতিফ সিদ্দিকী দেশের বিভিন্ন জেলা থানায় গিয়ে 'সরেজমিন' প্রতিবেদন লিখেছেন। এই সফরে বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিদের কাছাকাছি গিয়ে তাদের সমস্যাগুলো দেখা, নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর এ্যসাইনমেন্ট দেয়া তথা 'অর্গানাইজেশনাল ওয়ার্ক' হয়ে থাকে। লতিফ সিদ্দিকী ঢাকাতেও রিপোর্ট লেখেন, যেমন লিখেছেন ৯৫-এর একুশের বইমেলা নিয়ে। সাধারণ ধারণা এটাই যে, সাব এডিটররা স্টাফ রিপোর্টারদের মতো রিপোর্ট লেখেন না, এই নিয়মটি ক্রমশ ভেঙ্গে যাচ্ছে।

পত্রিকার মফস্বল বিভাগ যেটি, তা বছর কয়েক আগেও ছিল নীচু বিবেচিত। অফিসে, সহকারী সম্পাদক বা সহ সম্পাদক, যারা বয়স্ক, মেধা ও কাজে একটু ঢিলে, কোন কোন পত্রিকায় তাদেরই সম্পাদনা করতে দেয়া হতো মফস্বল পাতাটি। কোন কাগজে লেখা থাকতো মফস্বলের পাতা, কেউ লিখতো 'শহর বন্দর গ্রাম'। এখন তা নেই। বাংলাবাজার পত্রিকায় 'জাতীয় সংবাদ' লেখা পাতায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে

www.pathagar.com

আসা খবরগুলো ছাপা হয়। ভোরের কাগজ পাতার নাম দিয়েছে 'এই জনপদ'। আজকের কাগজে আছে 'এই দেশ'। কেউ নাম দিয়েছে 'দেশের খবর'। সংবাদ, জনকণ্ঠ দৈনিক বাংলা, এসব পত্রিকায় আলাদা করে কিছু বলা হয় না। এই পাতা সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন অভিজ্ঞ সাংবাদিক, এসেছেন উচ্চ শিক্ষিত, চৌকষ, উৎসাহী কেউ কেউ। এদের পদ সাব এডিটর। প্রায় সবগুলো পত্রিকায় বিভাগীয় প্রধানকে সহায়তা করার জন্যে এক বা একাধিক সংবাদকর্মী (পদ : সাব এডিটর) দেয়া হয়েছে।

দেশের সবগুলো জেলা এবং গুরুত্বপূর্ণ থানায় যে প্রতিনিধি রয়েছেন, তারা ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যে খবর-ছবি, ফিচার পাঠান তা আসে মফস্বল বিভাগের টেবিলে। প্যাকেটের পাহাড়। খোলা হয় সেগুলো, বাছাই করা হয় কোন্‌টা অতি গুরুত্বপূর্ণ, তাড়াতাড়ি ছাপা হওয়ার মতো। এমনও খবর থাকে যেগুলো কুরিয়ার সার্ভিস বা ডাকযোগে এলেও প্রথম পাতায় ছাপা হবার মতো, সেগুলো দেয়া হয় বার্তা সম্পাদকের টেবিলে। আর যেগুলো, ভেতরের পাতায় ছাপা হবে মনে করা হয়, বিভাগীয় সম্পাদক বা তার সহকারী সম্পাদনা করেন তা।

খবরের গুরুত্ব অনুযায়ী বাছাই, প্রয়োজনীয় সম্পাদনা এবং শেষে একটি যুৎসই শিরোনাম ও কলাম পয়েন্ট মার্ক করে দিয়ে কম্পোজ বিভাগে পাঠানো হয়। সাবিং ডেস্ক থেকে যেমন কপি যায় কম্পোজে, খাতায় 'এন্ট্রি' হয়ে, এ বিভাগেও তাই। মফস্বলের কপি কম্পোজে গেলে সেখানে তা গ্রহণ করার সময় অনুমান নির্ভর একটা মাপ লিখে দেয়া হয়। এতে বোঝা যায় মফস্বল পাতার কয় কলাম কপি কম্পোজে গেল, কিংবা আরো কতোটুকু দিতে হবে। পরবর্তীকালে সেভাবেই সম্পাদনা ও কপি পাঠানোর কাজ এগোয়। মফস্বলের ঐ পাতাটিতে, ধরা যাক, বিজ্ঞাপন ছাপা হবে তিন কলাম। তাহলে বাকি থাকছে পাঁচ কলাম। এই পাঁচ কলামের কপি দেয়া হয়। এ থেকে যদি কোন কারণে বেঁচে যায়, যাকে বলে 'এক্সেস' হয়ে যাওয়া, তাহলে তা ব্যবহার করা হয় পরদিন।

এভাবে কোন একটি রিপোর্ট ঘটনাচক্রে পরপর কয়েকদিন একসেস হতে পারে। তবে এটা অতিগুরুত্বপূর্ণ স্টোরির ক্ষেত্রে নয়, ছোট বা কম গুরুত্বপূর্ণ আইটেমের বেলায় হয় সাধারণত। যেমন : আপনি যশোরের কেশবপুর থেকে খবর পাঠালেন কোন সাংবাদিকের বাড়িতে চুরি হয়েছে। 'সাংবাদিকের গৃহে দুঃসাহসিক চুরি' শিরোনামে ঐ ছোট খবরটি হয়তো কম্পোজ হয়ে যাবে, কিন্তু পরদিন ছাপা নাও হতে পারে জায়গার অভাবে।

জায়গাকে কাগজের ভাষায় বলে 'স্পেস'। এমন হতে পারে যে, চুরির খবরটি ডামিতে বসানো হলো, কিন্তু পরমুহূর্তে মফস্বল পাতায় এসে পড়লো আরো এক কলাম বিজ্ঞাপন। সে বিজ্ঞাপন আঁটানোর জন্যে আপনার বার্তাটি একসেস হয়ে যেতে পারে। আবার, পরদিন হয়তো এই মফস্বল পাতায় এলো পুরো পাতার এক বিজ্ঞাপন, কিংবা চাপ এলো যে প্রথম পাতার কোন বিশেষ বড় স্টোরি এ পাতায় জাম্প যাবে। সেক্ষেত্রেও ঐ বার্তাটি দ্বিতীয় দিনের মতো একসেস হতে পারে। তবে, এই পাতার বড় খবর, যা প্রথম শিরোনাম হয়ে ছাপানোর মতো, সেগুলো পুরো পৃষ্ঠা বাদ না পড়লে খুব একটা একসেস হয় না।

www.pathagar.com

স্টোরি সম্পাদনার সাথে সাথে, যদি সাথে ছবি থাকে, তা ছাপা হবে কিনা, ছাপা হলে কোনটা হবে, তার মাপ কতো কলাম ইঞ্চি হবে, তা বিভাগীয় সম্পাদক বা তাঁর সহকারী ঠিক করে নেন। ছবি পাঠানো হয় প্রসেস বিভাগে, পজেটিভ তৈরির জন্যে, আর ছবির ক্যাপশন যায় কম্পোজ বিভাগে। পাতাটির মেকআপের সময় প্রসেস বিভাগ থেকে ছবির পজেটিভ আসে, কম্পোজ থেকে আসে ঐ ক্যাপশন। একজন সংবাদদাতা ছবি পাঠানোর সময় ক্যাপশন লিখে দেন ছবির পেছনে, সেই সূত্র ধরে বিভাগীয় সম্পাদক পছন্দসই ক্যাপশন লেখেন। ছবির পেছনে ক্যাপশন লেখা থাকায় সম্পাদনা পরবর্তী একাধিক বিভাগে কাজ হলেও ছবি ও ক্যাপশনে গরমিল হয় না দুয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া।

কখনো কখনো পাঠক এমন হয়তো লক্ষ করেন যে ছবি ছাপা হয়েছে একটা কিন্তু ক্যাপশন বসানো হয়েছে অন্য এক ছবির। এটা আক্ষরিক অর্থে 'ছাপাখানার ভূত' নয়, হয় সিলোফিনে ছবি ক্যাপশন বসানোর সময় ভুল কিংবা এমন হয় যে, ডামি তৈরির সময় ভুল হয়ে যায়, পরে সিলোফিনে সেঁটে দেয়ার সময়ও ঐ ভুলটি থেকে যায়। এমন সংবাদকর্মী আছেন, যারা এসেছেন নতুন একেবারে, তারা ছবির পেছনে তার বিবরণ (ক্যাপশন) লেখেন না, এতেও বিভাগীয় সম্পাদক বিভ্রান্তিতে পড়েন।

মফস্বল—এই বিভাগের, তা জাতীয় সংবাদের পাতা, 'এই দেশ', 'এই জনপদ' যা-ই বলুন, তার সম্পাদনা কাজটি হয় সাধারণত দিনের ভাগে। পত্রিকা ভেদে সকাল দশটা বা এগোরোটা থেকে কাজ শুরু, ইতিমধ্যে ম্যাটার কম্পোজ বিভাগে পাঠানো খবরগুলো, কম্পোজ হয়ে যায়, এরপর শুরু হয় 'ডামি' তৈরি। বিভাগীয় সম্পাদক আগেই মনে মনে একটা ছক আঁকেন পাতার কোন জায়গায় কোন খবর বা ছবি দেয়া হবে। ম্যাটারের সাথে শিরোনাম, আগেই যা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে, তা-ও আসে। এগুলো কেটে কেটে সাঁটানো হয় ডামিতে। প্রয়োজন হলে খবরগুলো ডামিতে পুনর্বিন্যাস করা হয়, শিরোনাম বদলও হয়, কোন কোন ফিচার বা খবরে বক্স মার্ক হবে তাও চিহ্নিত করা হয়। এই ডামিটি চলে যায় পেজ মেকআপ বিভাগে যাকে বলে 'রিটাচ সেকশন'।

ছয় ঘণ্টা ডিউটি আওয়ার থাকলেও কোন কোন কাগজের বিভাগীয় সম্পাদককে কাজ করতে হয় আরো বাড়তি সময়ের জন্যে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা এই খবরগুলো নিশ্চয়ই বৈচিত্রপূর্ণ, পাঠকেরা পড়েন, দেশের জেলা থানা গ্রাম-গঞ্জে কি ঘটছে জানতে পারেন তারা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা অফিসের টেবিলে বসে এই সম্পাদনা কাজটি যেমন কঠিন, তেমনি একঘেঁয়ে।

যেসব কাগজের বাইরের প্রতিনিধিরা পাকা হাতের, তাদের খবর সম্পাদনা করতে তেমন বেগ পেতে হয় না, তবে এমনও আছে যে, খুব কাঁচা লেখা, বাক্যে বাক্যে ভুল, হাতের লেখা পড়া দুষ্কর। সেক্ষেত্রে খুব দেখেশুনে সম্পাদনা করতে হয়। এই খবরগুলো ছাপার অক্ষরে যখন পাঠকের সামনে যায়, তখন ভুলভ্রান্তি থাকলে সেটা সম্পাদনারই ব্যর্থতা বিবেচিত হয়ে থাকে, সে কারণে প্রতিটি কলমের আঁচড়ে থাকে উদ্বেগ, সাবধানতা। এই বিভাগটিতে, এমনি যে লোকবল না থাকলে হয়ে ওঠে ঝামেলা। কম্পোজ বিভাগের কাজ কিছুটা হালকা, সেকারণে 'কপি' দেয়ার চাপ তাড়া থাকে, সম্পাদনার কাজটি করতে হয় দ্রুত হাতে।

www.pathagar.com

অবশ্য, এই চাপ এড়াবার জন্যে কোন কোন বিভাগীয় সম্পাদক আগের দিনই কম্পোজে দিয়ে যান 'এডভান্স কপি'। সেগুলো কম্পোজ হতে হতে পরের দফায় টাটকা সম্পাদনাকৃত কপি দেয়া হয়। একসেস কপি, যদি থাকে, তাও চাপ কমায়। এমন হলো যে আগের দিন কম্পোজ হয়েছে পুরো আট কলাম ম্যাটার, কিন্তু বিকেলের দিকে কিছু বিজ্ঞাপন এসে পড়ায় তার সবটা ব্যবহার করা যায় নি, একসেস হয়েছে, তেমনি হলে ঐ পাতাটির সম্পাদনার চাপ-তাড়া কমে যায়।

হালে, ভেতরের পাতায় ছাপানো দেশের খবরের শিরোনাম লিখন, সংবাদ ও ছবি বিন্যাসের রীতি, বেশ বদলে গেছে, যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে লেখার স্টাইল। সমস্যাভিত্তিক খবর, গাঁওগ্রামের রাজনীতির হালচাল, অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন, সরেজমিন প্রতিবেদন, ছোট-ছোট আকারের মজার মজার খবর, এগুলো আসছে।

আগে, দু'দশক আগের কথা ধরুন, কথিত মফস্বলের পাতায় প্রকাশিত খবরের 'ফলো-আপ' তেমন দেখা যেতো না, এখন তা বেশ কয়েকটি পত্রিকায় হচ্ছে। ছবির সংখ্যা যেমন বেড়েছে, ছবির মান বেশ ভালো হয়েছে, ডিসপ্লে ভালো হচ্ছে।

কয়েক বছর আগেও, এই মফস্বলের পাতার ছবি মানে ছিল কোন অনুষ্ঠানে ডিসি এসডিও সাহেবের ফিতাকাটা, ডাকাত ধরা পড়লে পেছনে সারিবদ্ধ দাঁড়ানো পুলিশের ছবি, ভাঙ্গা রাস্তা সেতু, এ ধরনের বাঁধা-বিষয়ের আরো কিছু। এখন বহু নতুন নতুন বিষয়ের ওপর ছবি ছাপা হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্যশূন্যতা বা তথ্যবিভ্রান্তি থাকলেও গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যাপার-বিষয়গুলো আসছে খবর বা ফিচার হিসেবে, অবশ্য যেসব পত্রিকায় স্পেস আছে, সেগুলোতে।

সেই শুরু থেকে ঢাকার বাইরের খবরগুলোকে, 'মফস্বলের' খবর হিসেবে দেখা হয়ে আসছিল, এখন তা বেশ কেটে যাচ্ছে। সাংবাদিকতার সদর-মফস্বল বলে কিছু নেই সেটা বুঝতে পারছেন সংশ্লিষ্টরা। 'সংবাদ' কর্তৃপক্ষ এক সময় মফস্বল ডেস্কটিকে ভেঙে ন্যাশনাল ডেস্কের সাথে এক করার একটা উদ্যোগ নেন, নানা কারণে তা হয়ে ওঠে নি, কিন্তু ব্যাপকভাবে সমন্বয় সাধিত হয়েছে ঢাকার সংবাদ আর ঢাকার বাইরের সংবাদ সংগ্রহ বা প্রাপ্তি, সম্পাদনা, পরিবেশনার মধ্যে। তবে এখন পর্যন্ত কয়েকটি মহানগরী বাদে আর সব জেলা থানার খবরগুলো সম্পাদনা-পরিবেশনার জন্যে আলাদা ডেস্ক আলাদা রয়েই গেছে। মনে হয় না যে এতে খবরের অবমূল্যায়ন হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে খেলাধুলার ডেস্কের কথা বলা যায়, যে ডেস্কটি আলাদা, খবর যা হচ্ছে তা গুরুত্ব অনুযায়ী প্রথম পাতায় যাচ্ছে বা খেলাধুলার নির্দিষ্ট পাতায় যাচ্ছে, তাতে অসুবিধা হচ্ছে খবর বা ঐ পাতাটি সম্পাদনার।

সাধারণ কিছু পাঠক সাংবাদিক বলতে সাধারণত বোঝেন 'রিপোর্টার'কে। কাগজ ভেদে এদের লেখা হয় স্টাফ রিপোর্টার, প্রতিবেদক, নিজস্ব প্রতিবেদক, নিজস্ব বার্তা পরিবেশক।

বার্তা বিভাগ তথা একটি পত্রিকার অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এঁরা। এঁরা পত্রিকার পক্ষ থেকে দেয়া এসাইনমেন্ট অনুযায়ী ঘটনাস্থলে যান, খবর লেখেন, সেগুলো দেন বার্তা সম্পাদনা টেবিলে। আবার এঁরা নিজেরাও খবর সংগ্রহ করেন বিভিন্ন স্থান থেকে, বিভিন্ন

www.pathagar.com

মাধ্যমে, এগুলো, বলে বিশেষ রিপোর্ট (তবে সবক্ষেত্রে নয়) এবং তা রিপোর্টারের নামে ছাপা হয়।

রিপোর্টারের সংখ্যা একেক কাগজে একেক রকম। কোন কাগজে বিশজন আছে, আবার কোন কাগজে আছে পাঁচ-ছয় জন। এটা নির্ভর করে কাগজের মান, প্রচারসংখ্যা, মালিকের অর্থসাধ্য, লাভক্ষতি পলিসি, নানা ব্যাপারের ওপর। ধরা যাক, ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকে কাজ করছেন দশজন রিপোর্টার। এরা সবাই রিপোর্টার হিসেবেই বাইরে পরিচিত, কিন্তু সংবাদপত্রের কাঠামোগত পদমর্যাদা হিসেবে আছে জুনিয়রিটি-সিনিয়রিটি। কেউ এক নম্বর গ্রেডের, কেউ দু নম্বর, কেউ তিন নম্বর। জুনিয়র রিপোর্টার হলো তিন নম্বর গ্রেড। কাজ ভাল করলে, তার সম্পর্কে বিরূপ কোনকিছু না থাকলে তিনি পরবর্তীকালে হন দুই নম্বর গ্রেডের, হন তিনি সিনিয়র রিপোর্টার। এরপর একনম্বর গ্রেড এবং আরো পরে স্পেশাল গ্রেড পান। তিন-দুই-এক-স্পেশাল গ্রেড এর মধ্যে বেসিক (মূল বেতন)-এর পার্থক্য আছে। তিন নম্বর গ্রেডের বেসিক তিন হাজার টাকা, দু নম্বর গ্রেডের চারহাজার টাকা, এক নম্বর গ্রেডের ছ'হাজার টাকা। (এটা চতুর্থ ওয়েজ বোর্ডের মূল বেতন হিসাব। এখন সাংবাদিকরা পঞ্চম ওয়েজ বোর্ড দাবি করছেন)।

এখানে বলে রাখি, এই যে গ্রেড এবং বেতন কাঠামো, তা কেবল রিপোর্টারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সহকারী সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, রীডার, কম্পোজিটর ও সাধারণ বিভাগের কর্তা-কর্মচারীদের জন্যেও। একটি পত্রিকায়, যারা মালিক-নিয়োজিত, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক থেকে শুরু করে একেবারে নিচের দিকে পিওন-গার্ড পর্যন্ত ওয়েজবোর্ডের কাঠামো অনুসারে বেতন ভাতা বা আর সব সুবিধাদি পেয়ে থাকেন।

যা বলছিলাম। ধরুন একটা কাগজে আছে দশজন রিপোর্টার। এদের মধ্যে একজন হলেন, চীফ রিপোর্টার। বলাবাহুল্য ইনি সিনিয়র, আর সব রিপোর্টারদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা রাখেন। কোন একটি কাগজে অবশ্য দু'জন চীফ রিপোর্টার আছেন, একজন সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে সৃষ্ট সংবাদগুলো দেখেন, অপর জন ক্রাইম সংক্রান্ত সংবাদগুলো। এটা অবশ্য ব্যতিক্রম। চীফ রিপোর্টার অন্যান্য রিপোর্টারদের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করেন, কার কি এসাইনমেন্ট তা জানিয়ে দেন লিখিতভাবে, কখনো বা মুখে।

বার্তা বিভাগে একটি রেজিস্ট্রার আছে যার নাম 'এসাইনমেন্ট বুক'। এখানে ক্রমিক অনুসারে লিখে দেয়া হয় পরদিন কে কোন কাজটি করবে। এই খাতাটিতে নির্দিষ্ট দিনে কার অফ-ডে আছে, কে অফিস ডিউটি বা প্রেস রিলিজগুলো লেখার কাজ করবেন তা উল্লেখ করা হয়। চীফ রিপোর্টার ছাড়াও কাগজ ভেদে ঐ খাতায় এসাইনমেন্ট লিখে দেন সিটি এডিটর বা বার্তা সম্পাদকও । চীফ রিপোর্টার মাঝে মধ্যে নিজেও এসাইনমেন্টে যান বিশেষ কোন ঘটনা বা অনুষ্ঠান হলে। তিনি নিজের 'বিট' বা 'সোর্স' থেকে সংগ্রহ করা বিষয় নিয়ে বিশেষ রিপোর্টও লেখেন যা সাধারণত 'বাইলাইন' স্টোরি হিসেবে ছাপা হয়।

www.pathagar.com

রিপোর্টারদের নাম দিয়ে যে রিপোর্টগুলো পত্রিকায় ছাপা হয়, তাকে কাগজের ভাষায় বলে 'বাই লাইন স্টোরি'। কোন কোন কাগজে, যেখানে সিটি এডিটর নেই বা লোকবল কম, সেখানে চীফ রিপোর্টার আর সব রিপোর্টারের কাছ থেকে পাওয়া দৈনন্দিন স্টোরিগুলো পড়ে দেখেন, প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন, তারপর চূড়ান্তভাবে সম্পাদনার জন্যে বার্তা সম্পাদক কখনো বা চীফ সাব এডিটরের টেবিলে দেন। চীফ রিপোর্টার, যেহেতু বেশ ক'জন রিপোর্টারকে এসাইনমেন্ট দিতে হয়, তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হয়, সে কারণে তাকে হতে হয় যেমন সতর্ক চক্ষু তেমনি বন্ধুবৎসল মন, প্রত্যেক সহকর্মীর সাহায্যকারী।

যে রিপোর্টার যে কাজটির যোগ্য, তার কাজের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে কিনা, কে কোথায় ভুল করলো তা শুধরে দেয়া, উল্লেখযোগ্য ঘটনার ওপর কাজের জন্যে এসাইনমেন্ট দেয়া হলো কি-না, এরকম অনেক বিষয় তাকে নজরে রাখতে হয়। পরিচালনা দক্ষতা এখানে মুখ্য ব্যাপার।

একজন রিপোর্টার মূলত দু'ভাবে কাজ করেন। এক. তাকে কোন ঘটনা বা বিষয়ের ওপর এসাইনমেন্ট দেয়া হয় এবং তিনি তা কভার করেন, স্টোরি লেখেন। দুই. তিনি নিজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা এলাকায় গিয়ে বাছাই করা বিষয়ের ওপর স্টোরি লেখেন। আরো বিস্তারিত বলি : মনে করুন প্রেসক্লাবে হচ্ছে একটা সেমিনার, বা বায়তুল মোকাররম চত্বরে হচ্ছে কারো জনসভা, সেখানে উপস্থিত আছেন একজন রিপোর্টার। এটা তার এসাইনমেন্টের কাজ। এ কাজটা তাকে দেয়া হয়েছে আগের দিন। তিনি সেমিনার বা জনসভার বক্তব্য নোট করবেন কিংবা টেপ করবেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন, তারপর অফিসে গিয়ে স্টোরি লিখে দেবেন। কোন কোন পত্রিকায় সিনিয়র রিপোর্টাররাও এ কাজটি করেন, কেউ কেউ একাধিক এসাইনমেন্টও সম্পন্ন করেন পত্রিকায় জনবল (রিপোর্টার) কম থাকলে।

অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও একেক রিপোর্টারের একেকটি পলিটিক্যাল 'বিট' আছে। এমন যে, 'ক' করবেন আওয়ামী লীগ সংক্রান্ত রিপোর্ট, 'খ' করবেন বিএনপি'র বা 'গ' করবেন জাতীয় পার্টির 'ঘ' করবেন জামায়াতের ওপর (যদি কিছু থাকে) রিপোর্ট। এভাবে, কেউ জাতীয় সংসদের ওপর রিপোর্ট করেন, কেউ কূটনীতি বিষয়ক, কেউ অর্থনৈতিক বিষয়ক।

আপনি যে রিপোর্টটি পড়ছেন তার শুরুতে এ রকম লেখা আছে যে 'সংসদ বার্তা পরিবেশক' বা 'সংসদ রিপোর্টার'। এটি লিখেছেন তিনি যার পূর্ব নির্ধারিত দায়িত্ব হলো জাতীয় সংসদের অধিবেশনে কাজ করা। আবার কোন রিপোর্টে পড়ছেন অর্থনীতি বিষয়ের একটি সেমিনারের, এটিও লিখেছেন একজন ষ্টাফ রিপোর্টারই, কিন্তু তার দায়িত্ব হলো অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর রিপোর্ট করা।

বলা বাহুল্য, যিনি সংসদ অধিবেশনের রিপোর্ট লেখেন, কিংবা লেখেন অর্থনীতি বিষয়ে, তাকে সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত জানতে হয়। এবং যারা জানেন, অভিজ্ঞ, তাদেরকেই দেয়া হয় এসব দায়িত্ব।

আবার এসাইনমেন্ট ছাড়াও, লেখা হয় রিপোর্ট, সেগুলো হতে পারে ছোট বা বড় ঘটনা বিষয়ের, ছাপা হতে পারে নামে কিংবা 'স্টাফ আইটেম' হিসেবে। এটা নির্ভর করে

www.pathagar.com

ঘটনা-বিষয়ের গুরুত্ব রিপোর্টারের নিরাপত্তা, পত্রিকার পলিসি, রিপোর্টার প্রতিবেদনে তার নাম ব্যবহার করতে চান কি না, খবরের চাপ-পরিস্থিতি, এসবের ওপর। যেমন ধরুন, রিপোর্টার ক. তিনি সিনিয়র, সাধারণত বড় ঘটনা বা বিষয়ের ওপর রিপোর্ট লেখেন, তাই বলে ছোট বিষয়ের ওপর লিখবেন না, বা লেখেন না তা নয়।

তেমনি আবার খ. একজন জুনিয়র রিপোর্টার তিনি, ছোট বিষয়ের ওপর স্টোরি লিখতে লিখতে প্রধান শিরোনাম হয়ে যায় এমন খবরও লেখেন। অফিস থেকে দেয়া একটি এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করতে গিয়েও বড় চাঞ্চল্যকর রিপোর্টের মালমশলা পাওয়া যেতে পারে। যেমন, রিপোর্টার 'ক' গিয়েছেন ওষুধ ব্যবসায়ী সমিতির একটা প্রেস কনফারেন্স কভার করতে, অফিস থেকে এসাইনমেন্ট পেয়ে। সেখানে তিনি কারো (সূত্র) মুখ থেকে শুনলেন যে অমুক কোম্পানীর অমুক ওষুধ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাজারে বিক্রি হচ্ছে এবং তা ব্যবহার করে ব্যাধিগ্রস্ত হচ্ছে বহু মানুষ।

পরে এ সম্পর্কে আরো অনুসন্ধান চালানোর পর তৈরি হয়ে গেল বিরাট এক সংবাদ। হতে পারে প্রধান শিরোনাম কিংবা তিন-চার কলাম জুড়ে বক্স দিয়ে ছাপা হলো। অর্থাৎ, একজন রিপোর্টার তিনি নির্দিষ্ট এক এসাইনমেন্ট থেকে 'স্কুপ' খবরের জন্মদাতা হতে পারেন।

এটা অসত্য নয় যে কোন কোন পত্রিকার কোন কোন রিপোর্টার বিশেষ রিপোর্টের নামে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি-নির্ভর, স্রেফ টেলিফোন নির্ভর, সেভাবে তথ্য সংগ্রহ, লেখা ছাপাও হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার ব্যাপকভিত্তিক অনুসন্ধান, চেক-ক্রসচেক, ঘটনার ওপর জনপ্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করেও একটি 'বিশেষ রিপোর্ট' ছাপা হচ্ছে।

কোন কোন ঘটনা বা বিষয় থাকে যা 'কভার'করার জন্যে একাধিক রিপোর্টারকে এসাইনমেন্ট দেয়া হয়। যেমন ধরুন হরতালের খবরের কথা। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও স্টোরি লেখার জন্যে দায়িত্ব (এসাইনমেন্ট) দেয়া হলো ছয় জন রিপোর্টারকে। এলাকা ভাগ করা হলো এভাবে যে কেউ থাকবেন মতিঝিল এলাকায়, কেউ মগবাজারে, কেউ তেজগাঁও শিল্প এলাকায়, ফার্মগেটে, নিউমার্কেট এলাকায়, কেউ প্রেসক্লাব-পল্টন এলাকায়। এঁরা সংবাদ সংগ্রহ করেন তারপর অফিসে ফিরে এসে নিজ নিজ কর্মএলাকার পরিস্থিতির ওপর স্টোরি লিখে দেন।

পরে এগুলো একত্র করে, ঘটনার গড় পরিস্থিতির ওপর একটা ইন্ট্রো লিখে চূড়ান্ত সম্পাদনার জন্যে বার্তা সম্পাদনা টেবিলে যায়। পরদিন, প্রধান শিরোনাম হয়ে আসা 'সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে দু'জন নিহত' খবরটি পত্রিকা ভেদে 'স্টাফ রিপোর্টার' বা 'নিজস্ব বার্তা পরিবেশক' হিসেবে ছাপা হয়। এই রিপোর্টটি হয়ে ওঠে একটা টীম ওয়ার্কের ব্যাপার। হরতালের এই খবরটি, যদি হরতাল দেশব্যাপী হয়, তাহলে প্রধান খবরের নিচে আরেকটি খবর পড়েন আপনি যার শিরোনাম থাকে 'দেশের অন্যান্যস্থানে হরতাল পালিত'।

এই রিপোর্টের সংগ্রহ বা প্রাপ্তি পদ্ধতি অন্যরকম। এ খবরগুলো ফোনে ফ্যাক্সে পাঠান ঢাকার বাইরে নিয়োজিত স্টাফ রিপোর্টার ও নিজস্ব সংবাদদাতারা। এগুলো একত্র ও সম্পাদনা করে গড় পরিস্থিতির ওপর ইন্ট্রো লিখে কম্পোজে দেয়া হয়। এই যে পদ্ধতি, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তার রকমফের হতে পারে। এমন হতে পারে যে,

www.pathagar.com

দেশব্যাপী হরতালের সময় ঢাকায় তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি, কিন্তু চট্টগ্রামে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে মারা গেছে দশজন, আহত শতাধিক। সেক্ষেত্রে চট্টগ্রামের ঐ ঘটনা প্রধান শিরোনাম হয়ে যাবে।

আসলে, এসব নির্ভর করে ঘটনার গুরুত্ব, সময়, পরিস্থিতি পরিবেশ এবং পত্রিকার পলিসির ওপর।

পলিসির কথাটি বলি : চট্টগ্রামে ১০ জন নিহত হবার ঘটনা কোন পত্রিকায় পড়বেন আপনি প্রধান শিরোনাম হিসেবে, কোন পত্রিকায় আবার দেখবেন নিচের দিকে ছোট করে ছেপেছে। কেন এমন হলো? এটা পত্রিকার পলিসি। পত্রিকাটি হয়তো প্রকৃতপক্ষেই জনতার পক্ষে কথা বলে কিংবা বিরোধী দলের আন্দোলনের কথা বেশি লেখে, সেক্ষেত্রে চট্টগ্রামের ঘটনা বিশাল আকারে ছাপা হয়। আর এমন পত্রিকা থাকতে পারে যা এমন একটি রাজনৈতিক দলের মুখপত্র, এবং ঐ দলটির লোকজনই সন্ত্রাসী ঘটনাটি চালিয়েছে, সেক্ষেত্রে খবরটি কম গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হবে, সত্য ঘটনা একেবারেই উল্টা বিবরণে ছাপা হবে।

আরো বহু বিষয় বা ঘটনা থাকে যার জন্যে একাধিক রিপোর্টার কর্ম-দায়িত্ব পান। যেমন :

১. জাতীয় সংসদের অধিবেশন। একজন রিপোর্টার কাজ করলেন দিনের ভাগে, আরেকজন রাতের অংশে। আরেকজন হয়তোবা সংসদ অধিবেশনের ওপর 'সংসদের টুকিটাকি', 'সংসদ গ্যালারী থেকে', 'সংসদ রাউন্ডআপ', লিখলেন। আরো খবর হয়। যেমন, দু'জন রিপোর্টার কভার করছে অধিবেশন, এ সময় সম্পাদক বা বার্তা সম্পাদক আরেকজন রিপোর্টারকে এসাইনমেন্ট দিলেন এটা খুঁজে বের করতে যে, এ সরকার আমলের সংসদ অধিবেশনগুলোতে এ পর্যন্ত কতোগুলো বিল পাশ হয়েছে এবং কতো টাকা ব্যয় হয়েছে, কিংবা কতোজন সংসদ সদস্য শুল্কমুক্ত গাড়ি নিয়েছেন। এর ওপর আলাদা বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি হতে পারে।

২. ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে হচ্ছে হয়তো এক জনসভা যাতে বক্তৃতা করবেন বিরোধীদলের নেত্রী। জনসভাটি খুব বড়ো হবে, বহু বক্তা সেখানে বলবেন, আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষিত হতে পারে, ঘটতে পারে নানা ছোট-বড় ঘটনা, এমনটি হলে একাধিক রিপোর্টারকে এসাইনমেন্ট দেয়া হয়ে থাকে। একজন বক্তৃতা নোট বা রেকর্ড করে কারা বক্তৃতা করলো নাম নেন, উল্লেখযোগ্য বক্তার বক্তব্য সংগ্রহ করেন, আরেকজন সংগ্রহ করেন জনপ্রতিক্রিয়া, ছোটখাটো অথচ ইন্টারেস্টিং ঘটনা খোঁজেন। পরদিন, প্রথম রিপোর্টার ক-এর স্টোরি ছাপা হয় 'স্টাফ আইটেম' হিসেবে। আবার, দ্বিতীয়জন, অর্থাৎ খ. এর স্টোরি, যার শিরোনাম মনে করুন, 'জনসভায় দলে দলে এসেছিল বহু নারী' কিংবা 'হাসিনাকে এক নজর দেখার জন্যে' এ স্টোরি ছাপা হলো 'বাইলাইন' হয়ে।

৩. জন সমস্যার ওপরও রিপোর্ট করতে গিয়ে একাধিক রিপোর্টারকে আজকাল এসাইনমেন্ট দেয়া হচ্ছে। যেমন বাংলাবাজার পত্রিকা ঠিক করলো ট্রেন চলাচলে অব্যবস্থার ওপর রিপোর্ট ছাপবে, তারা কমলাপুর থেকে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়া ট্রেনে পাঠালো চারজন রিপোর্টার। কেউ গেলেন চট্টগ্রাম, সিলেট, কেউ গেলেন

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ জামালপুর হয়ে বাহাদুরাবাদঘাট, কেউ গেলেন জগন্নাথগঞ্জ ঘাট। সবাই ফিরে এসে যার যা দেখা বর্ণনা-বিবরণ লিখে দিলেন, ছাপা হলো বড় এক বিশেষ প্রতিবেদন।

দেশের চাল সংকট পরিস্থিতির ওপর এই পদ্ধতিতে কাজ হয়েছে বাংলাবাজার পত্রিকায় যা ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। কোন রিপোর্টার গেছেন ঢাকার চালের আড়তে, কেউ কেউ গেছেন কেরানীগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী। প্রধান একটি সরেজমিন প্রতিবেদনের নীচে এসব পার্শ্বপ্রতিবেদন (সাইড স্টোরি) পত্রিকাটির আধপাতা জুড়ে আলাদা আলাদা করে ছাপা হয় (বাংলাবাজার পত্রিকা ১৮, ১৯, ফেব্রুয়ারি '৯৫) এই স্টাইলটি বিষয় নির্বাচনের দিক দিয়ে নতুন, তবে এরকম কাজ আর সব পত্রিকায় আরো হয়েছে।

যেমন : প্রচলিত ধারা অনুযায়ী ঢাকার একুশের বইমেলার ওপর রিপোর্ট করেন একজন রিপোর্টার। কিন্তু, ৯৫-র ফেব্রুয়ারিতে ভোরের কাগজে পর্যায়ক্রমে তিন জন কাজ করেন, এরা সঞ্জীব চৌধুরী, ফরিদ কবির, লতিফ সিদ্দিকী। সঞ্জীব চৌধুরী মেলা পাতার সম্পাদক, ফরিদ কবির হলেন একজন সহকারী সম্পাদক, লতিফ সিদ্দিকী একজন সহ-সম্পাদক, এই জনপদ পাতাটি সম্পাদনা করেন। এক্ষেত্রে, দেখা যাচ্ছে, পাঠকদের সাধারণ প্রচলিত যে ধারণা রিপোর্ট লিখবেন একজন রিপোর্টারই, তা আর থাকে নি। সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত একজন সহকারী সম্পাদক বা মফস্বলের খবর সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত একজন সাব এডিটর বিষয় বা ক্ষেত্র বিশেষে রিপোর্টার হয়েছেন।

'৯৫-এর বইমেলার সময় জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ-এ একাধিক রিপোর্টার কাজ করেন। সংবাদ-এ মুক্তিযুদ্ধ ও পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার ওপর একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় দীর্ঘদিন ধরে। এটি ছিল সুপরিকল্পিত একটি উপস্থাপনা, যেজন্যে ঢাকার বাইরে কর্মরত নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, জেলা বার্তা পরিবেশক ও নিজস্ব সংবাদদাতাদের এসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছিল। এই পত্রিকার চীফ সাব এডিটর মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল এই ধারাবাহিক প্রতিবেদনটির মূল পরিকল্পক। ঢাকার বাইরে ৪০ জন রিপোর্টার কাজ করেন, গ্রন্থনা, সম্পাদনা, এসব কাজ করেন একাধিক সংবাদকর্মী। ঢাকায় বা ঢাকার বাইরে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের ফিচার প্রতিবেদন তৈরির ব্যাপারটি আগে দেখা যেতো না তেমন, এখন খুব হচ্ছে। যেমন : জনকণ্ঠ উত্তরবঙ্গের মংগার সময় পর্যায়ক্রমে একাধিক রিপোর্টার পাঠায় ঢাকা থেকে, তারা বগুড়া, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট অঞ্চলে এসে ঐসব এলাকার প্রতিনিধিদের (স্টাফ রিপোর্টার বা নিজস্ব সংবাদদাতা) নিয়ে সরেজমিন প্রতিবেদন লেখেন। সংগে আসা ফটোগ্রাফার পরিস্থিতির ওপর ছবি তোলেন। এটাও একটা 'টীম ওয়ার্ক'। ভোরের কাগজ রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট ছাপেন যা লিখেছিলেন সানাউল্লাহ-কাদির কল্লোল, বা কখনো সানাউল্লাহ-প্রণব সাহা, যৌথভাবে। সংসদ নির্বাচন, ঢাকাসহ বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন, বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা, এ সময়ে 'টীমওয়ার্ক' হয় নিবিড়, সুসংগঠিত।

www.pathagar.com

'৭৬ সালে রাজশাহীতে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ফারাক্কা মিছিলের সময় সেখানে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে একাধিক রিপোর্টার ফটোগ্রাফার পাঠানো হয়েছিল, তা ছিল ভালো টীমওয়ার্ক। আজকের দিনে এটা সম্প্রসারিত। সাপ্তাহিক পত্রিকাতেও। 'খবরের কাগজ' একটি বিষয়ের ওপর একাধিক জনের লেখা গ্রন্থনা করে ছাপছে যাতে কেবল প্রতিবেদক নন, আরো অনেকে লিখছেন। টীমওয়ার্কের মাধ্যমে বেশ কিছু কাজ হয়েছে সাপ্তাহিক বিচিত্রায়। যায়যায়দিন-এ উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ওপর দীর্ঘ সরেজমিন রিপোর্ট করেন প্রতিবেদক মুনিরুজ্জামান এবং কলামিস্ট মাহবুব কামাল যৌথভাবে। বিলুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিন্তা (সম্পাদক মিনার মাহমুদ), ফজলুল বারীর সময় পত্রিকায় একাধিক প্রতিবেদকের লেখা গ্রন্থনা করে ছাপা হয়েছে অনেকগুলো।

দৈনিক পত্রিকায়, একজন রিপোর্টার, তিনি সিনিয়র হোন বা জুনিয়র, নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিষয়, এলাকা, বিষয়ের ওপর তার দখল, এসব ছাড়াও বিশেষ প্রতিবেদন লেখেন। এই প্রতিবেদনের বিষয় তিনি কখনো চোখের সামনে পেয়ে যান, নিজের মেধা থেকে মৌলিক বিষয় নির্বাচন করেন, কোন মহল থেকে তার কাছে খবরের তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয়, আবার কখনো বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ, সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, এরা বিষয়টি ঠিক করে দেন।

১. চোখের সামনে পেয়ে যাওয়া : ধরুন, একজন রিপোর্টার, তার নাম হাসান, তিনি যাচ্ছেন কোন এক এসাইনমেন্টে, অথবা বাসা থেকে প্রেসক্লাবে আসছেন, পথে দেখলেন পিজি হাসপাতালের সামনে একটা জটলা। ব্যাপারটা কি? কাছে গিয়ে দেখলেন দু'টি শিশুর লাশ নিয়ে পিতামাতা হাহাকার করছে, বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে রিকশায় উঠছে তারা। কথায় কথায় রিপোর্টার শুনলেন যে এই শিশু দুটিকে জ্বর হবার পর ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী প্যারাসিটামল সিরাপ খাওয়ানো হচ্ছিল। সেটা খাবার পর শিশু দু'টি আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে, গুরুতর অবস্থায় তাদের হাসপাতালে আনা হয়, কিন্তু তাদের বাঁচানো যায় নি। এমন যদি হয় যে রিপোর্টার কথা বললেন হাসপাতালের ডাক্তারের সাথে, ডাক্তার বললেন, ঐ প্যারাসিটামল সিরাপে এমন বিষাক্ত কিছু ছিল যার বিষক্রিয়ায় শিশু দুটি মারা গেছে।

পরবর্তীকালে এ নিয়ে আরো অনুসন্ধান হতে পারে, মিলতে পারে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট, শিশু বিশেষজ্ঞের ভাষ্য পাওয়া যেতে পারে, ওষুধের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া যেতে পারে। এসব হলে রিপোর্টার লিখবেন এবং একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ হিসেবে তা পড়বেন আপনি। হ্যাঁ, বিভিন্ন স্তর এবং দৃষ্টিকোণ থেকেও এই বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন লেখা হতে পারে, সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর।

২. নিজের মেধা থেকে মৌলিক বিষয় নির্বাচন : একটি পত্রিকার রিপোর্টার আবেদ, ভাবছেন কোন মৌলিক বিষয়ের ওপর রিপোর্ট লিখবেন তিনি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাবছেন এমন কিছু লিখবেন যার জাতীয় প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব আছে, পত্রিকায় আদর করে ছাপবে, পাঠকরা লুফে নেবেন, কিন্তু আর কোন পত্রিকায় লেখে নি। ভাবলেন তিনি এ রকম : কি কারণে এদেশে মৌলবাদের উত্থান ঘটলো, কিভাবে তারা কাজ করছে, দেশের কোথায় কি ঘটনা ঘটছে, জনপ্রতিক্রিয়া, একাত্তুরে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার

www.pathagar.com

বিরোধিতা করেছিল তারা এখন কে কোথায়, এ নিয়ে ধারাবাহিক লিখবেন তিনি। খুব খেটে-খুটে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে স্টোরি লিখলেন তিনি। ছাপা হলে পরে অজানা বহু বিষয় পাঠকেরা জানতে পারলেন। অবশ্য, এটা নির্ভর করবে আবেদ তার দৈনন্দিন এসাইনমেন্টের ফাঁকে এতোগুলো সূত্রের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে কিনা, রেফারেন্স সংগ্রহ বা তা পড়তে পারবে কিনা।

তারপরেও কথা আছে। ঐ পত্রিকার মালিক বা সম্পাদক যদি এমন কেউ হন যে তিনি ছিলেন একাত্তুরের নরঘাতকদের সহযোগী, আজ ভালো সামাজিক অবস্থা-অবস্থানে এসে পত্রিকার মালিক-সম্পাদক, তাহলে তো আবেদ নিতান্তই বোকা না হলে ঐ বিষয়টি নিয়ে চিন্তাই করবেন না। এখানে, ঐ বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পত্রিকা প্রকাশক পক্ষের পলিসির ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ।

৩. কোন মহল থেকে তার কাছে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয় : কোন পত্রিকার রিপোর্টার ফারুক, তার সূত্র-শক্তি-পরিধি ভাল, চুটিয়ে রিপোর্ট লেখেন, প্রায়শই নামে ছাপা হয় তার স্টোরি, তার হাতে এসে গেল একটি প্যাকেট যাতে আছে কোন প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মকর্তার দুর্নীতির বিস্তারিত বিবরণ। দুর্নীতির ফিরিস্তি সরবরাহকারী যদি পরিচিত হন, বিশ্বস্ত হন, তাহলে স্টোরি তৈরি হয় কিছুটা সহজে, কম সময়ে, (তবু কিছু চেক ক্রসচেক করা হয়)। আর এমনও হতে পারে যে, যে প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে, সেটি, কিংবা সরবরাহকারীর পরিচয় জানেন না রিপোর্টার, তাহলে তিনি, যদি মনে করেন যে রিপোর্ট লিখবেন, ঐ প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান চালাবেন, খতিয়ে দেখবেন, বর্ণিত দুর্নীতির ব্যাপারগুলো। অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে স্টোরি লিখবেন।

আপনি বিভিন্ন কাগজে দুর্নীতির ওপর যে রিপোর্টগুলো পড়েন, তার কিছু রিপোর্টারের একেবারেই মৌলিক বিষয়-বাছাই ও অনুসন্ধানের ফসল, আবার এমনও কিছু আছে যা বিভিন্ন মহল বা পক্ষ থেকে সরবরাহকৃত।

রিপোর্টার ফারুক ভাবলেন যে আজকাল তো দুর্নীতি দমন বিভাগের দুর্নীতির কথা প্রায়শই শোনা যাচ্ছে, দেখা যাক না ব্যাপারটি খোঁজখবর করে, এবং ঐ বিভাগে কাজ করছেন এমন কোন পরিচিত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করলেন, মেলা তথ্য হয়তো পেয়েও গেলেন, স্টোরি লিখলেন। এটা তার নিজস্ব বিষয় নির্বাচন-চিন্তার ফসল।

আবার, এমন হলো যে, দুর্নীতি দমন বিভাগের দুই কর্তার মধ্যে আছে দ্বন্দ্ব-কোন্দল, জুনিয়র কর্তা, যেভাবেই হোক ডিঙ্গিয়ে চলে গেছেন ওপরের দিকে, এখন তার অপর সহকর্তা ভাবছেন দেবো ব্যাটার দুর্নীতির কাহিনী পত্রিকায় সব ফাঁস করে, সেক্ষেত্রে তিনি তার পূর্ব পরিচিত রিপোর্টার ফারুকের সাথে যোগাযোগ করলেন, ধরিয়ে দিলেন ঐ কর্তার দুর্নীতির ফিরিস্তি। সেটা চেক ক্রসচেক হবার পর (সবক্ষেত্রে এটা নাও হতে পারে) লেখা হলো স্টোরি।

সরবরাহ করা খবরের আরো কিছু সাধারণ-স্বাভাবিক দিক আছে। যেমন : পত্রিকায় সরবরাহ করা হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কেউ সরবরাহ করলেন কোন ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর, এগুলো থেকে স্টোরি এমনকি পরবর্তীকালে খুব বড় স্টোরি হতে পারে।

www.pathagar.com

৪. পত্রিকা থেকে সরবরাহ করা : রিপোর্টার জাফর, চৌকশ, দুহাতে লেখেন, বিশেষ কোন বিষয় হলে তাকে, কিংবা আর সব রিপোর্টারকেও, ঘটনা বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী বিশেষ রিপোর্টের কাজ করতে দেন পত্রিকার মালিক, সম্পাদক বার্তা সম্পাদক। এটা হতে পারে মালিক, সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক এরা জাফরকে ডেকে নিয়ে বিষয়টির ওপর কাজ করতে দেন। কিংবা রিপোর্টার্স মিটিং-এ এসাইনমেন্টটি দেন। জাফর সূত্রের সাথে যোগাযোগ করেন, ঘটনাস্থলে যান, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন, স্টৌরি লেখেন।

মনে করুন একটি দৈনিকের সম্পাদক সাহেব ভাবলেন তার পত্রিকায়, চালের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যাবার নেপথ্য কারণগুলো কি?—এ নিয়ে একটা প্রতিবেদন ছাপাবেন, এতে প্রকাশিত হবে সরকারের খাদ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ বিতরণ নীতিতে কোন গলদ ছিল কিনা, মূল্য বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ীদের কোন কালোহাত আছে কিনা, সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে কিনা, ধানের উৎপাদন কম হয়েছে কিনা। তিনি জাফরকে যোগ্য মনে করলেন এবং এ বিষয়টির ওপর খোঁজ খবর করে প্রতিবেদন লিখতে বললেন। একই এসাইনমেন্ট রিপোর্টার্স মিটিংয়েও দেয়া হতে পারে।

সম্পাদক বা বার্তা সম্পাদক নির্দেশিত হয়েও কাজ করতে হতে পারে জাফরকে। কোন কোন পত্রিকায়, দেখা যায়, অতি এক্সক্লুসিভ কোন বিষয় হলে, যদি সন্দেহ হয় যে এটা কোনভাবে ফাঁস হয়ে যেতে পারে অন্যত্র, রিপোর্টটি মার খেতে পারে, সেক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় এ্যাসাইনমেন্ট দাতা ও রিপোর্টারের মধ্যে।

একজন রিপোর্টারের লেখা প্রতিবেদন, সেটা নামেই ছাপা হোক বা স্টাফ আইটেম হিসেবে ছাপা হোক, দু'য়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া আপনি বুঝতে পারবেন না বিষয়টি সাংবাদিকের হাতে এসেছে কিভাবে। এমন হতে পারে যে, আপনি জানেন আপনার পড়া পত্রিকায় রিপোর্টার 'খ' সাধারণত লেখেন অর্থনীতির ওপর রিপোর্টগুলো। তার লেখার স্টাইল, বাক্যগঠন কৌশল, শব্দ চয়ন, এগুলোর সাথে আপনি অনেকদিন থেকেই পরিচিত। সেক্ষেত্রে, অর্থনীতির ওপর বিশেষ কোন লেখা, নামে ছাপা না হলেও আপনি বুঝতে পারবেন ওটা খ-এর লেখা। এই প্রতিবেদনটি যদি অর্থনীতি সমিতির একটি সেমিনারের ওপর লেখা হয়, খ-এর নাম ছাপা না হয়, তাহলে আপনি বুঝবেন এটা একটা এসাইনমেন্টের খবর। অর্থনীতি সমিতির সেমিনারের যে নিমন্ত্রণ পত্র (বা প্রেস বিজ্ঞপ্তি) অফিসে এসেছিল, তা হাতে পেয়ে, অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিবেদক হিসেবে রিপোর্টার খ ঐ সেমিনার কভার করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু, 'দেশের অর্থনীতি রুগ্ন হয়ে পড়েছে' এই শিরোনামে প্রকাশিত খ এর রিপোর্ট, তা তার নিজস্ব চিন্তার ফসল, না কোন মহল থেকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, না অফিস থেকে এসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছে, সহজে বোঝা যায় না।

নানাভাবে খবর হাতে পান রিপোর্টাররা, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন (বা তৈরি অবস্থায় হাতে পান) নানা পদ্ধতি-মাধ্যম কৌশল প্রক্রিয়ায়। এটা নির্ভর করে বিষয়টি কি, বিষয়টির সাথে কোন্ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি জড়িত, রিপোর্টারের সূত্র কতোটা ব্যাপক ও বিশ্বস্ত, পেশার প্রতি কতোটা তিনি কমিটেড, তিনি কতোটা মেধা সম্পন্ন, কাজে ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন।

www.pathagar.com

এখানে পত্রিকার পলিসি, রিপোর্টার কাজ করবার সুযোগ-সুবিধা পান কতোটা, বেতন ভাতা এবং আর সব অর্থ জোগান পর্যাপ্ত দেয়া হয় কিনা, এসবও কোন কোন ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে যে তিনি বিশেষ কোন প্রতিবেদনের তথ্য উপাত্ত, যাকে বলা হয় খবরের মালমসলা, সংগ্রহ করতে সফল হবেন কিনা। রিপোর্টার কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর খবর লেখার ব্যাপারে উৎসাহী, সেগুলো সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে কতোটুকু, যোগাযোগ সুবিধা কিরকম পাচ্ছেন, মায় পত্রিকার প্রচারসংখ্যা, পত্রিকার প্রভাব, বিশ্বাসযোগ্যতা কতোটা আছে, সেগুলোও কখনো কখনো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

হামিদ একজন রিপোর্টার, রাজনীতি বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা আছে তার, সূত্র পরিধি বিরাট-ব্যাপক, দহরম-মহরম উচ্চ পর্যায়ে সর্বত্র, সবসময়। কিন্তু এমন হতে পারে যে, রাজনীতি বিষয়ে রিপোর্ট করেন এমন আর সব রিপোর্টারের সাথে যোগাযোগ- সম্পর্ক তেমন তার নেই। সেক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে সাড়াজাগানো খবরটি হাতে না-ও পেতে পারেন।

উদাহরণ হিসেবে বলি : '৯৫-এর ফেব্রুয়ারিতে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ অবসর নেবার পরদিন তাঁর এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের বিবরণ (অনানুষ্ঠানিক) বিরাট সংবাদ হয়ে আসে বিভিন্ন পত্রিকায়। কিন্তু দু'য়েকটি বড় পত্রিকা তা মিস-ও করে। এর নেপথ্য কারণ ছিল এরকম : কয়েকজন সাংবাদিক মিলিতভাবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের বাসায় যান, তখন ঐ বড় পত্রিকার রিপোর্টার হামিদ ছিলেন না। যারা গিয়েছেন ঐ সাক্ষাৎকারে তাদের সাথে পরে হামিদের যোগাযোগও হয় নি। সেক্ষেত্রে তার পত্রিকা ঐ খবরটি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, পাঠকও বঞ্চিত হয়েছেন। অর্থাৎ, খুব ভালো রিপোর্টার হয়েও একই বিষয়ের ওপর কাজ করছেন তেমন রিপোর্টারদের সাথে ঘটনার দিন কোন কারণে যোগাযোগ না ঘটায় হামিদ বড় এক সংবাদ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছেন।

পত্রিকার বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, একজন রিপোর্টারের খবর পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে। রফিক রিপোর্টার হিসেবে ভাল, অনেক পড়াশোনা তার, মেলা সূত্রের সাথে যোগাযোগও আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে পত্রিকার বিশ্বাসযোগ্যতা নেই পাঠকের কাছে। প্রচারসংখ্যাও খুব কম, হতে পারে একপেশে খবর পরিবেশন করে, সেক্ষেত্রে রফিক কোন প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষ একটি বিষয়ের খবর, সাধারণত যা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি পর্যায় থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে, তা না-ও হাতে পেতে পারেন। প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি চাইবেন তার খবরটি এমন পত্রিকায় ছাপা হোক যার বিশ্বাসযোগ্যতা আছে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলে বা পাঠকের কাছে।

বলাবাহুল্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিবেশিত কোন কোন খবরের ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে। যিনি খবর দিচ্ছেন তিনি কেমন, তার রাজনৈতিক-সামাজিক পরিচিতি, মন মানসিকতা, পত্রিকার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা, খবরের ধরন, তার প্রতিক্রিয়ার মাত্রা, এসব বহুবিধ কারণেও কোন একটি বিশেষ খবর কেউ পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন।

ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা তথ্যমন্ত্রী থাকা অবস্থায় (মন্ত্রীত্বের শেষ দিকে) একটি সাড়াজাগানো খবরের মানুষ হয়ে ওঠেন। তার একটি সাক্ষাৎকার ইনকিলাবে ছাপা হয়

www.pathagar.com

যার বিষয় ছিল রাজনৈতিক সংকট মোচনে তাঁর ব্যক্তিগত কিছু প্রস্তাব। এই সাক্ষাৎকারটি ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা নিজেই লেখেন এবং কম্পিউটারে কম্পোজ করে সাংবাদিককে দেন। জানা যায় প্রথমে তিনি মুদ্রিত সাক্ষাৎকারটি ইত্তেফাকের রিপোর্টার শাহজাহান সরদারকে দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজস্ব পলিসিগত কারণে ইত্তেফাকে তা ছাপা হয় নি। পরে একই সাক্ষাৎকারটি ইনকিলাবের সাংবাদিককে দেয়া হয় এবং পরদিন তা ছাপাও হয়, ঐ সাক্ষাৎকারের বক্তব্য নিয়ে সরকারি মহল তো বটেই আর সব রাজনৈতিক দল ও সমাজের অন্যান্য পর্যায়ে হৈচৈ পড়ে যায়।

. . . এখন প্রশ্ন, তথ্যমন্ত্রী তার ঐ সাক্ষাৎকারটি কেবল ইত্তেফাক এবং ইত্তেফাক না ছাপলে পরে ইনকিলাবে ছাপানোর জন্যে দিলেন কেন? এ প্রশ্ন পাঠক হয়তো করবেন। আমি তার জবাব দেবো না, এটা বলতে পারবেন ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা নিজেই। এখানে, একজন সাংবাদিকের বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া না পাওয়া প্রসঙ্গের আলোচনায় এটা বলতে চাই যে, সংবাদের ধরন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তার পরিচিতি, মনমানসিকতা, এসবও নির্ভর করে একটি কাগজের একজন রিপোর্টারের হাতে খবর (বিশেষ বিষয়) পৌঁছুবে কিনা।

উদ্দেশ্যমূলক তথা গছিয়ে দেয়া খবরের ক্ষেত্রে, একটি বিশেষ খবর যেমন কেউ পান কেউ পান না, তেমনি আবার এমনও হয় যে, ঐ খবরটি কেউ নেন, কেউ নেন না। কিংবা নিলেও লেখেন না, লিখতে পারেন না। এর পেছনেও নানা ফ্যাক্টর কাজ করে। যেমন :

১. এমন হতে পারে যে, রিপোর্টার হামিদ তার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। এক আমলা আরেক আমলা সম্পর্কে দিলেন কোন খবর, উদ্দেশ্যমূলকভাবে, হাতে গছিয়ে, হামিদ যখন বুঝতে পারছেন যে আমলাটি এই খবর ছাপিয়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধি করবেন, পত্রিকা এবং সাংবাদিকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাবেন তখন তিনি হয়তো ঐ বিশেষ খবরটি হাতে পেলেও স্টোরি লিখবেন না।

২. এমন হতে পারে যে, প্রাপ্ত খবরটি ছাপা হলে তিনি এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হারাবেন, তাহলে তিনি তা লিখবেন না।

৩. এমন হতে পারে যে, খবরটি হামিদের পত্রিকার পলিসির বিরুদ্ধে যাবে, খবর ছাপা হলে বিরাট জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাহলে তিনি তথ্য-উপাত্ত সরবরাহকারীর কথিত 'ভালো খবরটি' লিখবেন না।

৪. এমন হতে পারে যে, রিপোর্টার হামিদ মনে করছেন রিপোর্টটি ভাল হবে, ছাপালে পরে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করা হবে, কিন্তু পত্রিকার মালিক, সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক এঁরা হয়তোবা কোন কারণে চান না যে ঐ খবরটি ছাপা হোক। সেক্ষেত্রে হামিদ তথ্য-উপাত্ত হাতে পেলেও খবরটি লিখতে পারবেন না।

পত্রিকাটি, যা আপনি দৈনিক পড়েন, তা কোন দল বা মতের, কি ধরনের খবর বেশি ছাপে, তার সম্পাদকীয় নীতিমালা কি, এসব থেকে শুরু করে ঐ পত্রিকায় কোন্ কোন্ বিভাগ আছে, বিজ্ঞাপন কতোটা কেমন পায়, প্রচার সংখ্যা কতো, ধারে কাছের এমন ন্যূনতম ধারণা নিশ্চয়ই আপনার আছে। কিন্তু এটা জানেন কি, আপনার প্রিয়

www.pathagar.com

পত্রিকার রিপোর্টার কাজ করেন কিভাবে? কিভাবে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করেন আর লেখেন? কিরকম তার প্রাত্যহিক জীবন ধারা?

এটা নির্ভর করে কিন্তু পত্রিকার রকমভেদ, রিপোর্টারের সংখ্যা, খবর পরিবেশনের স্টাইল, খবর ছাপানোর মতো স্পেস কতোটা আছে, এধরনের আরো কিছু বিষয়ের ওপর।

ধরুন, একটি দৈনিক, তাতে নিয়োজিত আছেন ১৬ জন রিপোর্টার, এদের অধিকাংশই সিনিয়র, ভাল বেতন ভাতা পান, তাই বলে যে ১৬ জনের সবাইকে রোজ রোজ খাটতে হয়, তা নাও হতে পারে। কেননা, পত্রিকাটিতে বিজ্ঞাপনের চাপ বেশি, ভেতরের পাতায় তো বটেই, প্রথম পাতাতেও অধিকাংশ দিন অর্ধেক জায়গা জুড়ে থাকে বিজ্ঞাপন, সেক্ষেত্রে বেশি আইটেম (স্টাফ আইটেম) ছাপানোর মতো স্পেসই মেলে না। এক্ষেত্রে, এই পত্রিকাটির রিপোর্টারদের কাজের চাপ বেশ কম। ১৫ জনের মধ্যে হয়তো ৬/৭ জন বিভিন্ন এসাইনমেন্ট করেন কিংবা প্রয়োজনীয় আরকিছু কাজ। এই পত্রিকার কাউকে ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে বিশেষ বিষয় বা সমস্যাভিত্তিক রিপোর্টিং এর কাজ করানো হয়, কেউ হয়তো পলিটিক্যাল বিট করেন, কেউ এগ্রিকালচার বিট। তা-ও রোজ নয়। সেক্ষেত্রে একটুখানি ঢিলেঢালা থাকা যায়, অফিসে হাজিরায় সময়ের হেরফের হতে পারে, আড্ডা আসর জমানোর মতো সময়ও মেলে।

কিন্তু, এমন যদি হয় যে, পত্রিকাটিতে রিপোর্টার মাত্র ৮ জন, কিন্তু প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন নেই বললেই চলে, সেখানে রিপোর্টারদের কাজের চাপ খুব বেশি। একজনকে একাধিক এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করতে হয়, তারপরেও সপ্তাহে তিন চারটি 'বিশেষ রিপোর্ট' লিখে দিতে হয়। অফিসে সময়মতো হাজিরা, রিপোর্টার্স মিটিং-এ উপস্থিত, এসাইনমেন্ট অনুযায়ী ঘটনাস্থলে যাওয়া, সূত্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী স্টোরি তৈরি, এসব করতে গিয়ে জান পেরেশান হয়ে যায় একজন রিপোর্টারের।

কোন কোন পত্রিকার আন্তঃব্যবস্থাপনাগত কারণেও একজন রিপোর্টারের কাজের চাপ কিংবা চাপ কমতি হতে পারে। এমন হতে পারে যে, পত্রিকার ৮জন রিপোর্টারের মধ্যে একজন স্বভাবগতভাবে ঢিলে, কাজ কম করেন, কিংবা কোন কারণে তাকে কাজের চাপ কম দেয়া হয়, যে কারণে আর সব রিপোর্টারের ওপর কাজের চাপ বেশি পড়তে পারে। একজন রিপোর্টারের সপ্তাহে একদিন 'অফ-ডে' থাকে, তারপরেও কোন কারণে একাধিক রিপোর্টার ছুটিতে থাকলে পরে কর্তব্যরত বাকি রিপোর্টারদের ওপর কাজের চাপ বেশি পড়তে পারে।

জাতীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলে, যখন ঐ ঘটনা বা বিষয়ের ওপর কয়েকজন রিপোর্টার প্রয়োজন, তখন কাজের চাপ বেশি পড়তে পারে। যেমন : অনুষ্ঠিত হচ্ছে ধরুন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন, তা 'কভার' করবার জন্যে ৮ জনের মধ্যে ৬ জনকে নানা জায়গায় কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই ৬ জনতো বটেই বাকি ২ জন রিপোর্টারের ওপরও অন্যান্য বিষয়ের ওপর কাজের চাপ পড়ে। ৮ জনের মধ্যে একজন থাকেন নির্বাচন কমিশনে, একজন অফিসে ডিউটি করেন থানা পুলিশে যোগাযোগ বা

www.pathagar.com

আর সব স্থানে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে, ৪ জন রিপোর্টার চারটি এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন দায়িত্ব পালন করেন। বাকি যে ২ জন রিপোর্টার থাকলো, তারা সম্পন্ন করেন নির্বাচন কাজে আর সব বিষয় বা ঘটনার ওপর। এতে চাপ পড়ে।

সারাদিন 'ডিউটি' করবার পর সন্ধ্যায় অফিসে এসে পাতার পর পাতা লিখতে হয়। পত্রিকার ভাষায় পাতাকে পাতা বলা হয়না, বলা হয় স্লিপ। যেমন বলা হয় অমুক রিপোর্টটা তিন স্লিপ, অমুক রিপোর্টটা দশ স্লিপ।

ব্যাপক গণআন্দোলন, হরতাল-ধর্মঘট, একাধিক দলের জনসভা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জাতীয় নির্বাচন বা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন, সংসদ অধিবেশনের সময়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন সম্মেলন, এই ধরনের ঘটনার সময় রিপোর্টারদের কাজের চাপ বেশি থাকে। অফিস থেকে যদিও দায়িত্ব বণ্টন কর্মটি হয় সুষ্ঠুভাবে, কিন্তু কোন পত্রিকার রিপোর্টার সংখ্যা কম থাকলে কাজের চাপ বেড়েই থাকে কাঁধের ওপর। এমন উদাহরণ আছে যে, এ ধরনের ঘটনার সময় কোন পত্রিকায় সাব এডিটরদের রিপোর্টার হিসেবে কাজ করানো হয়, কোন পত্রিকায় খণ্ডকালীন সময়ের জন্যে উৎসাহী তরুণ ফ্রিলান্স সাংবাদিক নিয়োগ করা হয়, কোন সময় আবার ঐ বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞকে দিয়ে আলোচনা পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন লেখানো হয়।

যেমন, '৯০তে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো সার্ক ক্রিকেট, এর আগে, '৯৩-এর ডিসেম্বরে হলো সাফ্ গেমস, এসময়গুলোতে প্রায় প্রতিটি পত্রিকা বিভিন্ন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশেষ 'কলাম' লেখায়। কলামগুলো পাঠকের সমাদর পায়, সেইসাথে কোন কোন ক্ষেত্রে রিপোর্টারের ওপর সামান্য হলেও চাপ হালকা হয়।

আজকাল, কোন কোন পত্রিকা, যেমন 'ভোরের কাগজ' প্রথম পাতায় ছাপছে 'অতিথি কলাম'। কলাম লেখেন একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। বেশ বড় জায়গা (স্পেস) নেয় বলে সামান্য হলেও রিপোর্টের চাপ কম থাকে। অবশ্য, এটা নয় যে, খেলাধুলা, রাজনীতি এই সব বিষয়ের ওপর অতিথি লেখকদের কলাম ছাপলেই রিপোর্টারদের কাজ করতে হবে না। খেলার খবর বিস্তারিত সংগ্রহ করতে হয় স্পোর্টস রিপোর্টারকে, রাজনৈতিক বিষয়ে ঘটনা ঘটলে সেগুলো বিট অনুযায়ী রিপোর্টারদের সংগ্রহ করতে ও লিখতে হয়, কর্মব্যস্ত তাদের থাকতেই হয়।

কাজের কথা ধরুন : ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হয়েছে সকাল ৯ টায়, শেষ হলো বিকেল ৫ টায়, এই ৮ ঘণ্টা স্পোর্টস রিপোর্টারকে খেলা দেখতে হলো, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হলো, প্রয়োজনে খেলোয়াড় কোচ বা ম্যানেজারের সাক্ষাৎকার নিতে হলো, তারপর আবার সন্ধ্যায় বা রাতে অফিসে এসে সে স্টোরিগুলো লিখতে হলো একটানা দীর্ঘক্ষণ। এক্ষেত্রে কাজের চাপ হয়ে ওঠে দারুণ। খেলার পাতার ৮টি কলাম ভরতে কম লিখতে হয় না, ওদিকে আবার এক বা একাধিক স্টোরি প্রথম পাতায় ছাপা হয়, সেগুলোও লিখতে হয়। ঐ পত্রিকায় যদি ৩ জন স্পোর্টস রিপোর্টার থাকেন এবং তাদের যদি লিখতে হয় কমপক্ষে ৮ কলামের মতো ম্যাটার, তাহলে সেটা হয়ে ওঠে ভীষণ মানসিক চাপের ব্যাপার। মুখ তুলে তাকানোর ফুরসৎ নেই, খুব দ্রুত লিখে যেতে হবে স্লিপের পরে স্লিপ। এর মধ্যে আবার লক্ষ রাখতে হয় ফটোগ্রাফার কি কি ছবি তুলে এনেছেন, সেগুলোর কতোটা ছাপা যাবে, কি মাপে ছাপা হবে, কোন্‌টা প্রথম পাতায়

www.pathagar.com

যাবে। এছাড়াও খেলার সময়ে বা পরে স্টেডিয়ামে যদি বড় ধরনের কোন সংকট বাঁধে, হতাহতের ঘটনা ঘটে, অগ্নিসংযোগ বা ভাংচুর ঘটনা ঘটে, সে খবরও লিখতে হয় একজন স্পোর্টস রিপোর্টারকে।

অর্থাৎ অন্যকোন এলাকায় হলে যে রিপোর্ট লিখলে একজন ক্রাইম রিপোর্টার অথবা সাধারণ বার্তা রিপোর্টারদের কেউ, কিন্তু এক্ষেত্রে (স্টেডিয়ামের গোলমাল) এসে স্পোর্টস রিপোর্টারের বিট বদল হয়ে যায়।

এছাড়াও, একটি ম্যাচের আগে দলের প্রস্তুতি কেমন, কোন কোন খেলোয়াড় খেলবে, কোন বিদেশী খেলোয়াড় আসবে কিনা, এসব নিয়ে এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট করার চাপ তো থাকেই। আর, ঐ যে খেলা দেখা, দিনের ভাগে স্টেডিয়ামে হাজির থেকে রিপোর্টার যা করলেন, তা সাধারণ এক দর্শকের খেলা দেখার মতো হলে চলে না। রিপোর্টারকে খেলা দেখতে হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নিজের মেধায় বিচার বিশ্লেষণের ব্যাপারটিকে ধরে রেখে। স্ট্রাইকার খেলার কোন সময়ে কোন জায়গা থেকে বলটি ভলি করলেন, কার পায়ে তা পড়লো, তিনি কতোটা দ্রুত বলটিকে এগিয়ে নিয়ে গোলমুখে শর্ট করলেন, কিন্তু কেন তা গোলপোস্টের একটুখানি ওপর দিয়ে চলে গেল, প্রতিটি ক্ষণ তাকে 'মাইণ্ড কনসেনট্রেড' করে রাখতে হয়। তারপরেও আছে খেলার মান বা পরিস্থিতি সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা-বিশ্লেষণ, আছে দর্শক মন্তব্য মতামত সংগ্রহের ব্যাপার। গোল দিতে ব্যর্থ হলে পরে আসলাম কিভাবে মাথায় হাত রেখে হায় আফসোস করতে লাগলো, ঐসময় দর্শকরা কিভাবে হৈহল্লা করে উঠলেন, যাবতীয় বিষয় নোটবুকে বা মেমোরিতে ধরে রাখতে হয়। পাঠক এসব বিবরণও চান।

তাছাড়া, খেলা কতোদিন চললো এবং কার স্কোর কতো, সামনের দিনে কার কার খেলা হবে, কোন দলের খেলোয়াড় অসুস্থ হয়ে পড়ায় খেলতে পারবে না, কি কারণে স্টেডিয়ামে দর্শকদের দুপক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল ছোঁড়াছুড়ি শুরু হয়ে গেল, এরকম শতেক বিষয়-ঘটনা তাকে দেখতে হয় বা সংগ্রহ করতে হয়। এক্ষেত্রে, যে কাগজে স্পোর্টস রিপোর্টারের সংখ্যা বেশি, স্বাভাবিকভাবে কাজের চাপ কম, না হলে উল্টো পরিস্থিতি।

কোন কোন কাগজে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলার সময় রিপোর্টারদের সহকারী নেয়া হয়, অন্যান্য রিপোর্টারও কাজ করেন, যেমন একজন রিপোর্টার, তিনি স্পোর্টস রিপোর্টার নন, কিন্তু খেলাধুলার বিষয়ে উৎসাহী, মাঝে মধ্যে লেখেনও তিনি স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে লিখলেন 'গ্যালারী থেকে'। আলোচনা পর্যালোচনা বা ছোট খাটো মজার মজার ঘটনা নিয়ে তাতে লেখা হয়।

আজকাল অবশ্য 'অতিথি কলাম' বেশি চলছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, স্পোর্টস বিভাগের জন্যে নির্দিষ্ট রিপোর্টারই কেবল খেলাধুলার ওপর রিপোর্ট করেন। সবক্ষেত্রে এটা হয় না। বর্তমানে বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, এর আগে যখন ইত্তেফাকের কূটনৈতিক রিপোর্টার (পদ : স্টাফ রিপোর্টার) ছিলেন, তখন তিনি বিদেশে গিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলাধুলার ওপর রিপোর্ট করেছেন। '৯৪-এর বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার ওপরও তিনি রিপোর্ট করেন বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদক থাকা অবস্থাতেও।

www.pathagar.com

এখানে বলে রাখি, হালে কয়েকটি পত্রিকায় 'স্পোর্টস ডেস্ক' গড়ে উঠেছে। একাধিক রিপোর্টার কাজ করেন, বিদেশী খবরগুলো অনুবাদ করার জন্যে সাব এডিটর নেয়া হয়েছে। তবে, এই পৃথক 'ডেস্ক' যেখানে গড়ে ওঠে নি, সেখানে, খেলাধুলার খবরের খুব চাপ থাকলে, বিদেশী খেলাধুলার খবর অনুবাদ করার দায়িত্ব দেয়া হয় সাধারণ 'সাবিং ডেস্ক' এর কোন কর্মীকেও। কিংবা স্পোর্টস রিপোর্টারও স্টোরি লেখার পাশাপাশি 'স্লাগ' করে থাকেন।

এই 'স্লাগ' হলো : আপনার প্রিয় পত্রিকায় দেশী বা বিদেশী খেলার ওপর খবর যখন আপনি পড়েন, তখন কিছু ছাপা হয় বাই লাইন, কোনটি থাকে স্পোর্টস রিপোর্টার, কোনটিতে লেখা থাকে স্পোর্টস ডেস্ক। কোন্ কাজটি কে করেছেন বোঝা যায় না। তবে এটুকু জানবেন যে, দেশী বা বিদেশী যে খবরই হোক, স্পোর্টস রিপোর্টারের লেখা বা কোন সাব এডিটরের অনুবাদ কর্মই হোক, তার রচনা নেপথ্যে থাকে অনেক শ্রম।

শ্রম দিতে হয় আর সব বিষয়ের ওপর লেখা প্রতিটি স্টোরির ক্ষেত্রে, অন্তত যেগুলো মৌলিক বিষয়ের ওপর, কিংবা যা ব্যাপক ভিত্তিক অনুসন্ধান করে লিখতে হয়। যেমন ধরুন : ক্রাইম রিপোর্টের কথা। সব পত্রিকায় আছে ক্রাইম রিপোর্টার।

আসুন দেখি এরা কিভাবে খবর সংগ্রহ করেন বা খবর হাতে পেয়ে যান। একজন ক্রাইম রিপোর্টার, 'ব' তিনি অফিসে এসে বসলেন সন্ধ্যায়, বসেই টেলিফোন করতে লাগলেন মহানগরীর বিভিন্ন থানায়। একের পর এক। আছে ভাই কোন খবর? খুন-খারাপি, ছিনতাই, কোথাও কোন গোলমাল, কিছুই নেই? না থাকে তো নেই, থাকলে টুকে নেন প্রাপ্ত তথ্য। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই যদি স্টোরি হয়, লিখে ফেলেন তা, কিন্তু এমন কোন বিষয়ের খবর থাকে যেজন্যে পরবর্তীতে আরো কিছু মহলে (বা জড়িত সূত্রের সাথে) যোগাযোগ করেন তিনি।

এটা নির্ভর করে খবরের গুরুত্ব, খবরটি কোন সময়ে হাতে পেলেন, ঘটনাস্থল কতোদূর, কাগজ থেকে ঐদিন কতোটা স্পেস দিতে পারবে, এসব নানা ব্যাপার বিষয়ের ওপর।

তেজগাঁও থানা থেকে জানানো হলো সেখানে তিনজন ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে, কিংবা রমনা থানা থেকে খবর মিললো কাছের এক বস্তি থেকে একজনের লাশ পাওয়া গেছে যে, যুবতীটি আত্মহত্যা করেছে। ক্রাইম রিপোর্টার এটি জানলেন, প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো টেলিফোনে টুকে নিলেন, লিখে দিলেন খবর, যা পরদিন ছাপা হলো 'তেজগাঁয়ে তিন ছিনতাইকারী গ্রেফতার।' বা 'রমনার অমুক বস্তিতে এক যুবতীর আত্মহত্যা।' এ ধরনের খবর সাধারণত আকারে হয় ছোট, সিংগেল কলামে ছাপা হয়। অন্যান্য খবরের চাপ বেশি থাকলে ডিসপ্লে হতে পারে পেছনের পাতায় কিংবা এমনও যে ছয় বা সাতের পাতায়, মহানগর পাতা থাকলে সেখানে। কিন্তু এমন হতে পারে যে, রাজধানীতে মাসখানেক ধরে একের পর এক ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পুলিশ একজনকেও ধরতে পারছে না, তাহলে অনেক দিন বাদে 'তিনজন ছিনতাইকারী পাকড়াও' খবরটি গুরুত্ব পেতে পারে।

www.pathagar.com

এমন যদি হয় যে, গতকাল যে দুর্ধর্ষ ছিনতাই হয়েছে, খুব নামকরা কোন ব্যক্তি বা তার পরিবার সদস্যের কারো মালামাল ছিনতাই করেছিল যারা তারাই (ঐ ৩ জন) ধরা পড়েছে, কিংবা পুলিশের সাথে রীতিমত গোলাগুলি হবার পর ছিনতাইকারীরা (ঐ ৩ জন) ধরা পড়েছে, কিংবা দুজন মহিলা নিজেদের শক্তি সাহস থেকে ঐ ৩ ছিনতাইকারীকে ধরে ফেলেছে, তাহলে খবরটি হয়তোবা প্রথম পাতায় খুব ভালো ট্রিটমেন্ট পাবে।

ঘটনা যতো বড় হবে, ব্যক্তি বা সময়ের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, রিডিং মেটেরিয়াল বেশি থাকবে, ততোই তার প্রকাশ-গুরুত্ব বেড়ে যাবে। দিকটি লক্ষ রেখেই সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার সংগ্রহ করবেন খবরটি। রমনায় এক যুবতী আত্মহত্যা করেছেন এটা ছোট খবর, ছোট করেই হয়তোবা ছাপা হবে, কিন্তু ঐ যুবতী তার ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে দুই মস্তানকে কুপিয়ে হত্যা করেছে তারপর আত্মহত্যা করেছে, তাহলে সেটি বড় খবর হয়ে যাবে। রিপোর্টারের অনুসন্ধান ও লেখার কাজ কিছু বিস্তৃত-ব্যাপক হবে। ঐ যুবতী যদি রমনা বস্তির কোন মেয়ে না হয়ে ধরুন একজন চিত্রতারকা হন, এবং এমন যদি ধারণা করা হয় যে, ঘটনাটি আত্মহত্যা নয়, হত্যা করে আত্মহত্যার ঘটনা সাজিয়েছে, তাহলে বড় চাঞ্চল্যকর খবর হয়ে যেতে পারে।

তবে, এটি প্রকাশ নির্ভর করে খবর প্রাপ্তির সময়, প্রথম পাতায় স্পেস কেমন আছে, সেগুলোর ওপর। চিত্রতারকা আত্মহত্যা করেছে, এটা স্বাভাবিক সময়ে হলে ডবল কলাম স্টোরি হতে পারতো, কিন্তু এমন হলো যে, কাগজের ডামি তৈরি শেষ, মেকআপও হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে সাংবাদিক হাতে পেলেন খবরটা, তাহলে স্পেস দেয়া মুস্কিল। হয়তো বা খুব ঠাসাঠাসি করে লাইন কয়েক ঢুকিয়ে দেয়া হলো, তাও নির্ভর করবে ঐ চিত্রতারকা কোন স্তরের, আরসব পত্রিকা ঐ ঘটনাটি পেয়ে গেছে কিনা, এসবের ওপর। তা না হলে খবরটি রিপোর্টারের হাতেই থাকবে, পরদিন ব্যাপক বিস্তারিত খবরাখবর নিয়ে ছাপা হবে ঐ স্টোরি। আবার এমন হতে পারে যে, হত্যা ঘটনাটি রিপোর্টার সন্ধ্যাতেই হাতে পেয়েছেন, পুলিশের সাথে কথা বলবার পর নিজেই ঘটনাস্থলে গেছেন, নতুন তথ্য এনেছেন, ছবি সংগ্রহ হয়েছে, নিশ্চিতই স্টোরিটি প্রথম পাতায় ছাপা হবে, কিন্তু এমন হলো যে ঐদিন জাপানের ভূমিকম্পে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু সংবাদ এলো, একই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনায় ৩জন ছাত্র মারা গেল, একই দিনে গোটাদেশে হরতাল হয়েছে, তাতে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, বিকেলে বিশাল জনসভায় সরকার, বিরোধী দল কঠোর-কঠিন আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন, এধরনের খবরের চাপের ক্ষেত্রে চিত্রতারকার হত্যা বা আত্মহত্যার ঘটনা প্রথম পাতা থেকে চলে যেতে পারে শেষের পাতায়।

আবার এমনও হতে পারে যে, চিত্রতারকার হত্যা ঘটনাটি পাওয়া গেছে দিনের বেলা, তখন হাতে থাকবে অনেকটা সময়, ঘটনা সম্পর্কে পাওয়া যাবে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য, সেদিন আবার খবরেরও তেমন চাপ নেই, হয়ে যেতে পারে তিনকলাম চারকলাম বক্স, সেই সাথে থাকতে পারে আরো এক বা একাধিক ছোট স্টোরি।

ক্রাইম রিপোর্ট, যা বিভিন্ন থানায় যোগাযোগ করে টেলিফোনে সংগ্রহ করেন রিপোর্টার, তার প্রাপ্তিতে প্রকারভেদও রয়েছে। কোন ঘটনা আছে যা ফোন করে করে

www.pathagar.com

জেনে নিতে হয়, কিন্তু এমনো হতে পারে যে, ঘটনাটি নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে জানাচ্ছে পুলিশ। যেমন : 'বন্দুক যুদ্ধের পর পুলিশ দল বিপুল মালামালসহ পাকড়াও করেছে সাতজন ছিনতাইকারী' এই খবরটি প্রেস রিলিজ হয়ে আসবে অফিসে অফিসে, ধৃত ছিনতাইকারীদের ছবি সহ। সেক্ষেত্রে ফোন করে খবরটি সংগ্রহ করার অবকাশ থাকে না যদি না রিপোর্টার মনে করেন সরবরাহকৃত খবরে কোন তথ্য ঘাটতি রয়েছে। অর্থাৎ, প্রচারমূলক খবরগুলো পুলিশই সরবরাহ করে।

কোন কোন ক্রাইম রিপোর্টারের সাথে বিভিন্ন থানা পুলিশের সম্পর্ক ভালো, দীর্ঘবছর কাজ করতে করতে সূত্রের সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়, সেক্ষেত্রে কোন কোন খবর ঐ থানা থেকেই ফোন করে ঐ রিপোর্টারকে জানিয়ে দেয়া হয়। ক্রাইম রিপোর্টারদের পৃথক সংগঠন আছে, অনেক ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে ঘটনাটি, একই এসাইনমেন্ট মিলিতভাবে করেন, এই ভাব থেকেও একে অন্যকে ঘটনা-খবর জানান। এক্ষেত্রে কোন খবর খুব একটা মিস করেন না কোন রিপোর্টার। ক্রাইম সংক্রান্ত খবর অধিকাংশ পাঠক লুফে পড়েন, পত্রিকা সম্পাদনা পক্ষেরও নজর থাকে যে এই বিষয়টি যাতে তার কাগজ মিস না করে, সেকারণে ক্রাইম রিপোর্টারও থাকেন টেনশনে।

ধরুন, একটি পত্রিকায় পাশাপাশি বা উপর নিচে ছাপা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বিশাল জনসভার বক্তৃতার বিবরণ আর হোটেল ইলিসিয়ামে স্কুল ছাত্র হত্যার চাঞ্চল্যকর বিবরণ। পাঠক, আপনি আগে কোন্ খবরটি পড়বেন? যদি দ্বিতীয় খবরটি এর জবাব হয়, তাহলে বুঝুন পঠন বস্তু এবং সাধারণ পাঠক চাহিদা হিসেবে কোন্টা গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে, ইলিসিয়ামের কক্ষে ছাত্র হত্যার খবরটি মিস করা মানে পত্রিকার প্রচারসংখ্যায় তার কুপ্রভাব পড়া। এ ব্যাপারটির প্রতি তাই রিপোর্টার যেমন, তেমনি বার্তা সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এমনকি প্রকাশনা কর্তৃপক্ষও সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

এখানে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর জনসভা বা বক্তৃতা বক্তব্যের অবমূল্যায়ন করছি না, পাঠক মানসিকতার নিরিখে বাস্তব ব্যাপারটি যা, তাই বললাম।

সাধারণ স্টোরি ছাড়াও ক্রাইমের ওপর বিশেষ প্রতিবেদন প্রায়শই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়। এর মধ্যেও বিষয় নির্বাচনে মৌলিকত্ব থাকে, আবার কোনটা অফিস থেকে এ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে লেখানো হয়। একজন ক্রাইম রিপোর্টার রাজধানীর বিভিন্ন থানা, ডিএমপি'র প্রধান বা শাখা দফতর এবং সংশ্লিষ্ট সূত্রে টেলিফোনে খবর নিয়ে দৈনন্দিন ঘটনা-দুর্ঘটনার খবরাখবর লিখছেন, তার পাশাপাশি সময়ে সময়ে লিখছেন বিশেষ প্রতিবেদনও। বার্তা সম্পাদক বললেন : গতবছর মারা গেছে কতোটা, হত্যা ধর্ষণ চুরি ডাকাতি রাহাজানি ইত্যাদির ঘটনা ঘটেছে কতোটি তার ওপর একটা প্রতিবেদন লিখতে। এটা তার (রিপোর্টারের) জন্যে একটা এসাইনমেন্ট। সংশ্লিষ্ট সূত্রের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করলেন তিনি, স্টোরি লিখে ফেললেন। এটা এ্যাসাইনমেন্ট, রিপোর্টারের মৌলিক চিন্তার ফসল নয়।

কিন্তু এমন যদি হয় যে, রিপোর্টার ভাবলেন, এই যে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে এমনকি গাঁও-গ্রাম পর্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস, বাড়ছে খুন-খারাপি, ধর্ষণ, ছিনতাই, চুরি ডাকাতি, এর মূল আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপরে বিশেষজ্ঞরা কে

www.pathagar.com

কি বলছেন তার ওপর সাক্ষাৎকারমূলক একটা প্রতিবেদন লিখবেন, এটা তার মৌলিক কাজ। অবশ্য এধরনের কাজ বার্তা সম্পাদকও করিয়ে নিতে পারেন এ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে। এ ব্যাপারটি নির্ভর করে বার্তা সম্পাদক কি কি বিষয়ের ওপর কি ধরনের স্টোরি চান। নিজের পত্রিকার পাতাটিকে কতোটা খবর সমৃদ্ধ করতে চান তিনি।

অনেক পত্রিকায় মালিক, সম্পাদক এঁরাও বিভিন্ন মৌলিক বিষয় চিন্তা করেন, রিপোর্টারকে কাজ করতে বলেন। তবে, মালিক সম্পাদক এবং কাগজ ভেদে দুর্নীতি-অপরাধ এসব বিষয়ের ওপর রিপোর্ট ছাপা না ছাপা নির্ভর করে।

ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করাটাও এক ধরনের অপরাধ বটে। নিউজপ্রিন্টের কোটা তুলে বাজারে বেচে দেয়াটাও দুর্নীতি।

তা ধরুন, একজন পত্রিকা মালিক নিউজপ্রিন্ট বেচে দিচ্ছেন, তার পত্রিকায় নিশ্চয়ই আপনি আশা করবেন না যে 'পত্রিকার জন্য বরাদ্দ করা নিউজপ্রিন্ট বেচে দেয়া হচ্ছে' এ বিষয়ের ওপর একটা খবর ছাপা হয়ে যাবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসায় চুরি হয়েছে খবরটি আপনি কোন কোন পত্রিকায় হয়তো পড়বেন, কিন্তু কোন পত্রিকার মালিকপক্ষের সাথে ব্যবসায়িক বা আত্মীয়তাগত সম্পর্কে জড়িত থাকেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেখানে 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গৃহে চুরি' এ খবরটি ছাপা হবে না, রিপোর্টার খুব পাকাপোক্ত হলেও।

আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কতোটা অবনতি হয়ে গেলে পরে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে চুরি হয়। রাজনীতি এবং সামাজিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন খবর ছাপা হবে না।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ক্রাইম রিপোর্ট গদবাঁধা কিছু। কোথায় খুন হলো, চুরি ডাকাতি ছিনতাই হলো, আত্মহত্যার ঘটনা ঘটলো, এই হলো রিপোর্ট। এগুলো নাকি পাওয়াও যায় সহজে। কিন্তু আসলে থানায় থানায় টেলিফোনে যোগাযোগ করা, খবরটি বের করে নেয়া, একঘেঁয়ে, সময় সাপেক্ষ, এবং কাজটি যথেষ্ট টেনশনের।

থানা পুলিশের সাথে ভালো যোগাযোগ না থাকলে কোন কোন ঘটনার খবরে মার খেতে হয়। পরদিন কথা শুনতে হয় সহকর্মীদের বার্তা সম্পাদকের, সম্পাদকের, মালিকের। ঘনিষ্ঠ-পরিচিত পাঠকের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়। এমনিতে, কিছু বিষয়ের ওপর রিপোর্ট আছে, যেমন ধরুন, ছিনতাই হয়েছে একটি, মতিঝিল থানা এলাকায়, ক্রাইম রিপোর্টার কোন কারণে সে খবরটি মিস করলেন, খুব একটা প্রতিক্রিয়া হলো না অফিসে বা পাঠক মহলে, কিন্তু ধরুন একই থানার কোন এক মহল্লার বাসায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে, খুন হয়েছেন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, সমাজের নামকরা কেউ, সব কাগজে রিপোর্ট বেরুলো তার, কিন্তু সেটি উঠতি পাঠক প্রিয় কোন পত্রিকায় মিস হয়ে গেলে অফিসে কি বাইরে বাজে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এসব কারণে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন থাকতে হয় ক্রাইম রিপোর্টারদের। কোন কোন পত্রিকার রিপোর্টার, গুরুত্বপূর্ণ কোন খবরাখবর যাতে মিস না হয়, সেজন্যে থানা পুলিশে প্রতিদিন নিয়মিত যোগাযোগ তো রাখেনই, পুলিশ প্রশাসনে নিজস্ব সোর্স গড়ে তোলেন যারা নিজেই টেলিফোনে খবরটি জানিয়ে দেন রিপোর্টারকে খুঁজে-পেতে। বিভিন্ন

www.pathagar.com

পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টারদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পর্কও বেশ রয়েছে। একে অন্যের কাছ থেকে টেলিফোনে জেনে নেন কোথাও এমন কিছু ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটলো কিনা যা মিস হয়ে যাচ্ছে।

একসাথে অনেকগুলো সোর্সের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় বলে একজন ক্রাইম রিপোর্টারকে থাকতে হয় কর্মব্যস্ত। বিশেষ এ্যাসাইনমেন্টের কাজ চাপলে কিংবা একের পর এক খুন খারাপি ঘটতে থাকলে যখন রিপোর্টারকে ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ করতে হয়, তখন চাপ আরো বাড়ে। সে কারণে এখন অধিকাংশ পত্রিকায় একাধিক ক্রাইম রিপোর্টার নিযুক্ত হয়েছেন। এদের সিনিয়ররা বিশেষ বিশেষ স্টোরি লিখেন, জুনিয়ররা যোগাযোগ রক্ষা করেন থানা-পুলিশের সাথে।

কোন কোন ঘটনার ওপর রিপোর্ট লিখতে গিয়ে পক্ষপাতিত্ব, তথ্য বিকৃতি, অতিরঞ্জন, ইত্যকার অভিযোগ কোন কোন পাঠকের থাকলেও, সাধারণ বিভ্রাট কিন্তু তা নয়। বেশ কিছু পত্রিকায় খুব সাবধানতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ ক্রাইম রিপোর্টগুলো লেখা হয়। তরুণ রিপোর্টাররা বিশেষ বিশেষ ঘটনার ওপর সরেজমিন রিপোর্ট, বিশ্লেষণমূলক রিপোর্ট, ঘটনার ফলোআপ, এসব দক্ষতার সাথেই করে যাচ্ছেন।

অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর রিপোর্ট আজকাল বেশ প্রাধান্য পাচ্ছে পত্রপত্রিকায়। এগুলো লেখার জন্যে আছেন অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক, কিংবা ইংরেজিতে বলা হয় ইকোনমিক রিপোর্টার। অধিকাংশ পত্রিকায় একাধিক রিপোর্টার আছেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটিতে।

সাধারণ এসাইনমেন্ট ছাড়াও সম্পাদক বা বার্তা সম্পাদকের দেয়া মৌলিক বিষয়ের ওপর কিংবা রিপোর্টারের নিজস্ব চিন্তাভাবনা পরিকল্পনার ফসল হিসেবে বেরিয়ে আসা বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন লেখা হয়ে থাকে। চেম্বার অব কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি ফেডারেশনের একটি সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে, অর্থনীতি সমিতির একটা সেমিনার হচ্ছে, এগুলোর নিমন্ত্রণপত্র কিংবা প্রেস রিলিজ আগেই সংবাদপত্র অফিসে এসে যায়, ইকোনমিক রিপোর্টার তার এসাইনমেন্ট পেয়ে যান, নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত থাকেন তিনি, কে কি বললেন, কি কি ঘটনা ঘটলো তার ওপর স্টোরি তৈরি করেন।

কিন্তু, শিল্প কারখানা কি কারণে রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অর্থনীতি কিভাবে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, দেশের গার্মেন্টস শিল্পের হাল হকিকত কিরকম, এসব বিষয়ের ওপর রিপোর্ট লিখতে হলে রিপোর্টারকে যোগাযোগ করতে হয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বা সূত্রের সাথে। কখনো কখনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা, কারো রিসার্চ রিপোর্ট, এসবও কাজে লাগে স্টোরি তৈরিতে। যেমন ধরুন, বিআইডিএস থেকে একটা জরিপ করা হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য সম্পর্কে। সেই রিপোর্টের কপি জোগাড় করলেন একজন রিপোর্টার কিংবা বিষয়ভেদে তা তার কাছে সরবরাহ করা হলো, তারই ওপর ভিত্তি করে দেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য কিভাবে বাড়ছে, এ বিষয়ের ওপর স্টোরি লেখা হলো। অবশ্য, এ ধরনের রিপোর্টে সোর্স উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে মনে করা হয় স্টাফ রিপোর্টারদের মধ্যে যিনি ইকোনমিক বিট-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনি বুঝি কেবল লেখেন অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিবেদনগুলো। তা নয়।

www.pathagar.com

অন্যান্য বিটের রিপোর্টার কিংবা একজন সাব-এডিটরও অর্থনীতির ওপর স্টোরি লেখেন এমন উপমাও কয়েকটি পত্রিকায় রয়েছে।

'সংবাদ' এর কথা ধরুন, এই পত্রিকার শীফট ইনচার্জ যিনি একজন সাব-এডিটর, অজয় দাশগুপ্ত, তিনি তার নির্দিষ্ট কাজের বাইরেও অর্থনীতির ওপর রিপোর্ট লিখেছেন, এখনো লেখেন। তিনি অর্থনীতির পাতাটিও সম্পাদনা করে থাকেন। কয়েকটি পত্রিকা সপ্তাহে একদিন অর্থনীতি বা কৃষি অর্থনীতি বিষয়ক বিশেষ নিবন্ধের পাতা প্রকাশ করে থাকে। এই পাতা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন কোন সহকারী সম্পাদক, সহ সম্পাদক বা স্টাফ রিপোর্টার। কোন কোন পত্রিকায় অর্থনীতির পাতা সম্পাদনার ব্যাপারে পরামর্শকও আছেন, এরা ঐ পাতায় কার কার লেখা যাবে, কি বিষয়ের ওপর লেখা যাবে, কার সাথে যোগাযোগ করা দরকার এসব উপদেশ দেয়া ছাড়াও নিজেরা নিবন্ধ লেখেন।

যেমন সংবাদ-এ অর্থনীতির পাতা'র অতিথি পরামর্শক হলেন অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান।

অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ের ওপর হার্ড রিপোর্ট হয়, সফট্ রিপোর্টও হয়। এর বিষয়-চৌহদ্দিও অনেক বড়। খবরের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবেশন, এসবও হয় নানাভাবে।

কাগজে আপনি পড়ছেন, 'পাট শিল্প ধ্বংসের মুখে' এটাও অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্ট, পড়ছেন চেম্বার সভাপতির সাক্ষাৎকার, এটাও ইকনমিক বিটের আওতাধীন, আবার বাজারদর নিম্নমুখী না ঊর্ধ্বমুখী এই রিপোর্টটিও অর্থনীতি সম্পর্কিত।

তাই বলে কেবল ইকনমিক বিটের রিপোর্টারই সবগুলো বিষয় কভার করেন, এমন নয়। বার্তা সম্পাদক বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন জনের মধ্যে ভাগ করে দেন। সেক্ষেত্রে খুব হার্ড স্টোরিগুলো ইকনমিক বিটের নির্দিষ্ট রিপোর্টার লিখলেও কিছু সফট রিপোর্ট আছে যা লেখেন অন্যান্য বিটের রিপোর্টারও। আসলে, আলাদা আলাদা বিট-এ আলাদা রিপোর্টার থাকলেও জনবলের কম-বেশি বা মেধা-দক্ষতার ভিত্তিতে কাজের দায়িত্ব পান একজন রিপোর্টার। সাধারণত যিনি ক্রাইম রিপোর্ট লেখেন, খেলাধুলার রিপোর্ট লেখেন, তারা বাদে আর সব রিপোর্টার একাধিক বিটে কাজ করে থাকেন। যেমন বলি, সংবাদে সংসদ কাভার করেন চীফ রিপোর্টার কাশেম হুমায়ূন, জাফর ওয়াজেদ, এরা। কিন্তু সংসদ অধিবেশন বন্ধ থাকলে এরাই আবার অন্য বিষয়ের ওপর রিপোর্ট লেখার দায়িত্ব পান। সংসদ বিরতিকালে কাশেম হুমায়ূন সচিবালয় বিট কভার করেন, জাফর ওয়াজেদকে আওয়ামীলীগ বা অন্য কোন পলিটিক্যাল বিট কাভার করতে দেয়া হয়।

কোন কোন পত্রিকায় বিশেষ সংবাদদাতা (স্পেশাল করসপনডেন্ট) রয়েছেন, এরা সাধারণত স্পেশাল গ্রেডের বেতন ভাতা প্রাপ্ত, কাজের নির্দিষ্ট কোন বিট নেই। পত্রিকায় যে 'এসাইনমেন্ট বুক' রয়েছে তাতে লিখে দেয়া হয় না এদের আগামী দিনের কাজ কর্তব্য। কোন কাগজে বার্তা সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে আবার কোন কাগজে নিজের ইচ্ছেমতো বিষয় নির্ধারণ করে স্টোরি লেখেন তারা।

www.pathagar.com

সংবাদের বিশেষ সংবাদদাতা সাইয়িদ আতীকুল্লাহ 'সংসদের টুকিটাকি' লেখেন, ব্যাংক সম্পর্কিত রিপোর্ট লেখেন, আবার কখনো লেখেন আবহাওয়ার ওপর। বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, একজন সিনিয়র সাংবাদিক, কিন্তু অন্যান্য রিপোর্টারদের মতো এসাইনমেন্ট দেয়া হয় না তাকে।

বিভিন্ন পত্রিকায় মাঝে মধ্যে চোখে পড়বে 'ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি' বা 'ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা' হিসেবে ঢাকার বাইরের কোন এলাকার খবর ছাপা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা অঞ্চলভিত্তিক আছেন, আবার ঢাকা থেকেও বিশেষ এসাইনমেন্টে পাঠানো হয়ে থাকে।

যেমন ধরুন বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনা গেছেন টুংগীপাড়ায়, তার সাথে ঢাকা থেকে গেছেন একদল স্টাফ রিপোর্টার। টুংগীপাড়ায় শেখ হাসিনার জনসভার খবর হয়তো ইত্তেফাকে ছাপা হলো ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ক্রেডিট দিয়ে আবার অন্যপত্রিকার কেউ নামে পাঠালেন একই বিষয়ের ওপর স্টোরিটি। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কাগজের একজন বিশেষ প্রতিনিধি এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান কাভার করার জন্যে ঢাকার বাইরে যান, বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবেই তার রিপোর্টটি ছাপা হয়, আবার এমনও হয় যে একজন সিনিয়র রিপোর্টার ঐ অনুষ্ঠান কাভার করতে গিয়েছেন, তার পাঠানো খবরও বিশেষ প্রতিনিধি ক্রেডিটে ছাপা হয়। একজন সাব-এডিটর (সহ-সম্পাদক) তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন, সেখানে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা, তিনি তা ঢাকায় লিখে পাঠালেও 'বিশেষ প্রতিনিধি' ক্রেডিটে ছাপা হয়ে যেতে পারে।

এমন বহু উদাহরণ এদেশের সংবাদপত্রে রয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বিদেশ সফরে গেছেন কোন সম্পাদক বা বার্তা সম্পাদক, তিনি ঐ দেশ থেকে ঐ রাষ্ট্রপ্রধানের সফর সংবাদ ঢাকায় পাঠালেন, পরদিন তা তার নামে ছাপা হয়ে গেল, এমনও ঘটেছে।

আগেই বলেছি, খবর পরিবেশনকারী সাংবাদিকদের (স্টাফ রিপোর্টার) ক্ষেত্রে প্রচলিত যে নিয়ম, আধুনিক পত্রিকায় তা অনেক ক্ষেত্রে লুপ্ত হয়েছে। ভোরের কাগজ চালু করেছে অতিথি কলাম, তাতে বিবিসির সাবেক সংবাদদাতা আতাউস সামাদ নিয়মিত লিখছেন। তাঁর স্টোরিগুলো রাজনীতির ওপর, পর্যালোচনামূলক। এক্ষেত্রে প্রখ্যাত সাংবাদিক আতাউস সামাদ ভোরের কাগজের রিপোর্টার না হয়েও রিপোর্ট লিখছেন। মতিউর রহমান চৌধুরীর কথা আগেই বলেছি, তিনি বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদক হয়েও প্রায়শই কলাম ধর্মী রিপোর্ট লিখছেন, যা প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে, হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে আবার উল্টোটাও হচ্ছে। বাংলাবাজারের রেজা রায়হান মূলত একজন সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, কিন্তু তার পর্যালোচনামূলক কিছু স্টোরি ছাপা হচ্ছে তিনের পাতায়, পোস্ট এডিটোরিয়াল কলামে, সেক্ষেত্রে রেজা রায়হান সহকারী সম্পাদক বা কলামিস্টের ভূমিকা পালন করছেন।

একটি পত্রিকার রিপোর্টিং সেকশনে আরো কিছু সংবাদকর্মী আছেন। এরা সাংস্কৃতিক বার্তা পরিবেশক বা কালচারাল রিপোর্টার। ফিচার ধর্মী রিপোর্ট লিখিয়ে। কোন কোন পত্রিকার সাংস্কৃতিক বিষয়ক রিপোর্টার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও দেশী বিদেশী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার নেন, বাংলাদেশী যাদুঘর এইসব

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের ওপর রিপোর্ট লেখেন, বইমেলার ওপর দৈনিক রিপোর্ট লেখেন, আবার সাংস্কৃতিক বিষয়ক পাতা সম্পাদনারও দায়িত্ব পালন করেন। সংবাদ এর সাংস্কৃতিক বার্তা পরিবেশক সালাম জুবায়ের বয়সে তরুণ হলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির রিপোর্ট ছাড়াও প্রতিবছর বইমেলার ওপর রিপোর্ট লেখেন, আবার শিল্প সংস্কৃতির পাতা, খেলাঘর পাতা, সম্পাদনা করেন।

বোঝাই যায় কিরকম চাপ যায় একজন কালচারাল রিপোর্টারের ওপর। জনকণ্ঠে ফিচার লেখেন আশীষ উর রহমান শুভ, নিয়মিত, নানানটা তার বিষয়, তিনি আবার বইমেলা সহ আরো কিছু এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করেন। শুভ একজন রিপোর্টার, কিন্তু কাজকর্মে ফিচার রাইটার। সংবাদের অরুপ দত্তের রিপোর্ট অনেক সময় প্রথম পাতাতেও ছাপা হয়, ফিচার ধর্মী স্টোরি লেখেন তিনি, কিন্তু তার আফিসিক কাজটি হলো ঢাকার বাইরে থেকে কোন রিপোর্টার নিজস্ব বার্তা পরিবেশক জেলা বার্তা পরিবেশক বা নিজস্ব সংবাদদাতা টেলিফোনে খবর পাঠালে তা লিখে নেয়া।

প্রায় পত্রিকায় শিক্ষানবিস রিপোর্টার আছেন। এরা ওয়েজ বোর্ড অনুসারে নির্দিষ্ট বেতন পান। খুব ভালো বিষয়ের ওপর স্টোরি হলে তা প্রথম পাতাতে নামে ছাপা হয়। এছাড়াও শিক্ষানবিসদের অনেকেই খুব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেন, চালাক হলে সন্ধানে থাকেন স্কুপ খবরের। যে যতো ভালো কাজ দেখাতে পারবেন, তিনি রেগুলারাইজড হবেন তাড়াতাড়ি।

তবে, এমন উদাহরণের অভাব নেই যে, বছরের পর বছর খাটুনি করেও শিক্ষানবিস থেকে রেগুলার রিপোর্টার হতে হতে তিনি এক পত্রিকা থেকে আরেক পত্রিকায় চলে গেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় আছেন বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার, মেডিকেল রিপোর্টার, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার— এরা অধিকাংশই বাঁধা অঙ্কের টাকা পান। ধরুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন একটা ঘটনা ঘটলো, রিপোর্টার সেটি সংগ্রহ করে চলে এলেন পত্রিকা অফিসে, স্টোরি লিখে দিয়ে গেলেন। এই তার কাজ, তবে এরা অনেক সময় মৌলিক বিষয়ের ওপরও রিপোর্ট লেখেন।

সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলে যে রিপোর্ট লিখতে হয় তা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে, হতাহত হয়েছে ১০জন, এই রিপোর্ট যখন আপনি আগ্রহের সাথে পড়েন, তখন নিশ্চয়ই মনে হবে একজন বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টারকে কতো সাহস বুকে নিয়ে দলের নাম উল্লেখ করে রিপোর্টটি লিখতে হয়েছে। সন্ত্রাসী ঘটনার রিপোর্ট দু'পক্ষকে তুষ্ট করতে পারে না, অথচ ঐ রিপোর্টার, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রও বটে, তাকে হলে থাকতে হয়, ক্লাস করতে হয়, ক্যাম্পাসে ঘোরাঘুরি করতে হয়।

এই ঝুঁকির কাজ সত্ত্বেও একজন বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা খুব সামান্য অর্থ পেয়ে থাকেন। তাদের কনভেন্সও অনেকক্ষেত্রে দেয়া হয় না। তাদের কাজেরও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। রাত বারোটায় শুতে যাবে, এমন সময় শুরু হলো গোলাগুলি, ছুটতে হয় অফিসে, কিংবা অন্তত ফোন করে ঘটনাটি অফিসের কাউকে জানাতে হয়।

www.pathagar.com

নিরাপত্তার কারণে কোন কোন পত্রিকা, তাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতার খবর স্টাফ রিপোর্টার লিখে ছাপিয়ে দেয়। সংবাদদাতার জন্যে খুব ঝুঁকি হয়ে যেতে পারে, তিনি হামলার শিকার হতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হতে পারেন, এমন ঘটনা বা বিষয়ের রিপোর্টের ক্ষেত্রে এমনটি করা হয়ে থাকে।

আজ যেসব তরুণ সাংবাদিক বিভিন্ন দৈনিকে চুটিয়ে লিখছেন, তাদের অনেকেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার। ছাত্র অবস্থায় খণ্ডকালীন পেশা হিসেবে, কিংবা কেউ নিতান্তই শখ-উৎসাহে 'খবর লেখা' শুরু করেন। এখন পাশ করে বেরিয়ে পুরোপুরিভাবে এই পেশাটিকে বেছে নিয়েছেন। ইত্তেফাকের রেজানুর রহমান, জনকণ্ঠের খায়রুল আনাম মুকুল, রেওয়ানুল হক রাজা . . . এরা একসময় ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার।

কোন কোন পত্রিকায় এলাকাভিত্তিক রিপোর্টারও রয়েছে। যেমন সংবাদ-এর কাজী বেলাল হোসেন, তিনি মীরপুর প্রতিনিধি। এটা তার খণ্ডকালীন পেশা। প্রায়শই মীরপুর চিড়িয়াখানার ওপর স্টোরি লেখেন তিনি।

এখন, একটি পত্রিকায় এলাকাভিত্তিক রিপোর্টার নিয়োগের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। যেমন মতিঝিল এলাকার জন্যে একজন, মোহাম্মদপুর এলাকার জন্যে আরেকজন, এভাবে।

রাজধানীর আয়তন, জনসংখ্যা এসব বাড়ছে, ঘটনা দুর্ঘটনা বাড়ছে, অফিসে রিপোর্টারদের কাজের চাপ বাড়ছে, এ অবস্থায় মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় খণ্ডকালীন রিপোর্টার বা তথ্য সরবরাহকারী নিয়োগ করলে পরে কোন ঘটনার খবর এড়িয়ে যাবে না, সোর্স হিসেবে থানা পুলিশের ওপর নির্ভরতা কমবে। আজকের পত্রিকায় রিপোর্টিং-এ যে নেটওয়ার্ক, কয়েকবছর আগেও তা কিন্তু ছিল না। কাজের ক্ষেত্র (বিট) ভাগ করে দেয়ার ব্যাপারটি ছিল না। ক্রাইম রিপোর্টার, স্পোর্টস ডেস্ক, ইকনমিক রিপোর্টার এসব আলাদা আলাদা ছিল না। একই রিপোর্টার জনসভা কাভার করতেন, তিনিই আবার স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলাধুলার খবর সংগ্রহ করতেন।

এখন দিন ও পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। সংবাদ সংগ্রহ বিভাগের কর্ম-দায়িত্ব বিন্যাস ঘটেছে। এটা কেবল ঢাকায় নয়, ঢাকার বাইরেও ঘটছে। বেশ কয়েকটি পত্রিকা চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী সিলেট যশোর বগুড়া এসব শহরে পূর্ণাঙ্গ স্টাফ রিপোর্টার নিয়োগ করেছে। এদের কেউ কেউ ওয়েজবোর্ড অনুসারে সিনিয়র রিপোর্টার, ঢাকার টেবিলে কর্মরত একজন সিনিয়র রিপোর্টারের সমপরিমাণ বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পান।

চট্টগ্রামে ইত্তেফাকের সিনিয়র রিপোর্টার আছেন ওসমান গণি মনসুর, সাধারণ বিষয়ের ওপর রিপোর্ট ছাড়াও মাঝে মধ্যে এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট লেখেন তিনি।

খুলনায় আবু সাদেক বাংলাদেশ অবজারভারের একজন সিনিয়র রিপোর্টার। মানিক সাহা সংবাদের স্টাফ রিপোর্টার, টিএম রফিক ইনকিলাবের স্টাফ রিপোর্টার।

রাজশাহীতে আবুল হোসেন মালেক জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার।

বগুড়ায় সমুদ্র হক জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার, আমানুল্লাহ খান ইত্তেফাকের সিনিয়র রিপোর্টার।

www.pathagar.com

যশোরের শামসুর রহমান দৈনিক বাংলার স্টাফ রিপোর্টার, রুকনউদ্দৌলাহ্ সংবাদ-এর স্টাফ রিপোর্টার।

ইত্তেফাক সংবাদ অবজারভার ইনকিলাব বড় বড় শহরগুলোতে কেবল নয়, ছোট শহরেও আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে। ইত্তেফাকের অফিস আছে চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, যশোর, সিলেটে।

সংবাদের অফিস আছে চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া। ইনকিলাবের অফিস আছে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এমনকি সুদূর দিনাজপুরে।

অবজারভারের অফিস আছে চট্টগ্রাম, খুলনায়। দৈনিক বাংলার অফিস আছে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, যশোরে।

এসব অফিসে যারা রিপোর্টার, তাদের মৌলিক খবর কখনো নামে আবার সাধারণ ঘটনার খবরগুলো চট্টগ্রাম অফিস, খুলনা অফিস, রাজশাহী অফিস বা বগুড়া অফিস এভাবে ছাপা হয়।

অফিসগুলো বেশ সাজানো, পরিপাটি, টেলিফোনতো আছেই, এমনকি কয়েকটি পত্রিকার রিপোর্টারকে ফ্যাক্সও দেয়া হয়েছে। যেমন : আপনি যদি কখনো অবহেলিত উত্তরের দিনাজপুরে যান, দেখবেন বড় সাইনবোর্ড ইনকিলাব অফিসের। এটি আঞ্চলিক অফিস। অফিসে স্টাফ রিপোর্টার আছেন, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, অর্থ আদায়, হিসাব নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ম্যানেজার আছেন, পিওন আছেন। অফিসে এসি লাগানো, কার্পেট মোড়া, চমৎকার সোফাসেট সাজানো, টিভি চলছে। এই অফিস থেকে ৪৩০ কিঃমিঃ দূরের ঢাকায় রিপোর্ট চলে যাচ্ছে ইনকিলাব অফিসে।

একইভাবে, বগুড়ায় ইত্তেফাক ভাড়া নিয়েছে চমৎকার একটি ৪তলা ভবন, যেখানে টেলিফোন ফ্যাক্স সংযোগ ছাড়াও বহিরাগত কোন সংবাদকর্মীর থাকবার জন্যে নামমাত্র ভাড়ায় রেস্ট হাউসের ব্যবস্থা রয়েছে। ইনকিলাবের চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী অফিস বেশ জমকালো।

জনকণ্ঠ ঢাকার বাইরে ৪টি শহর থেকে বের হয়। এজন্য চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বগুড়ায় তাদের রয়েছে নিজস্ব প্রেস, সাধারণ বিভাগের লোকজন। সেখানে কম্পিউটার, মডেম, ফ্যাক্স-সরাসরি টেলিফোন সংযোগ এসব রয়েছে। অফিসগুলো আসবাবপত্রে সাজানো। বগুড়ায় সংবাদের অফিস রয়েছে সেখান থেকে মডেম সংযোগের মাধ্যমে 'সংবাদ' ছাপানোর উদ্যোগ আয়োজন চলছে।

ইত্তেফাক, ইনকিলাবের মতো প্রচার পত্রিকাগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবার জন্যে ঢাকার বাইরে একাধিক জায়গা থেকে জনকণ্ঠ স্টাইলে পত্রিকা বের করার চিন্তা ভাবনা করছে। এটা হলে ঢাকা থেকে দূর অঞ্চলের পাঠকরা সকাল বেলা পত্রিকা হাতে পেয়ে যাবেন।

বছর কয়েক আগেও, ঢাকার বাইরে যারা কাজ করতেন, তাদের বলা হতো মফস্বল সংবাদদাতা, ঢাকার বাইরের সংবাদ ছিল 'মফস্বল সংবাদ'। কর্ম ও কর্মকারকে ছোট করে দেখার এই মানসিকতাটা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে তো নিয়োগ করা হয়েছে স্টাফ রিপোর্টার, এছাড়াও আছেন নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নিয়োগকৃত জেলা বার্তা পরিবেশক, আছেন নিজস্ব প্রতিনিধি।

www.pathagar.com

ঢাকার বাইরে দৈনিক বাংলার নিজস্ব প্রতিনিধি আছেন বেশ কজন। এরা একজন স্টাফ রিপোর্টারের সমান বেতন সুবিধা পান। দিনাজপুরের আব্দুল বারী, পাবনার মীর্জা শামসুল ইসলাম এরা নিজস্ব প্রতিনিধি, আবার যশোরে শামসুর রহমান স্টাফ রিপোর্টার। ময়মনসিংহ কক্সবাজার এমনকি ফেনীর মতো ছোট জেলা শহরেও স্টাফ রিপোর্টার নিয়োগ করা হয়েছে। সংবাদ সিলেট জামালপুর বগুড়া গাইবান্ধা মেহেরপুর মানিকগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ এমনকি নীলফামারীর মতো ছোট জেলাতেও জেলা বার্তা পরিবেশক নিয়োগ করেছে বেশ কয়েকবছর আগে। এরা মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পান। এছাড়াও ফ্যাক্স টেলিফোন খয়খরচা, এখানে ওখানে ট্যুর করতে হলে খবর এবং ছবির জন্যে পৃথক টাকা দেয়া হয়।

প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় : ঢাকার বাইরের বিভাগীয় শহর, জেলা শহর গুরুত্বপূর্ণ থানা সদর এলাকায় প্রায় হাজার সংবাদকর্মী কাজ করছেন স্টাফ রিপোর্টার, নিজস্ব প্রতিনিধি, জেলা বার্তা পরিবেশক, নিজস্ব সংবাদদাতা হিসেবে।

পত্রিকার যারা নিজস্ব সংবাদদাতা, তাদের খবরের শুরুতে লেখা থাকে নিজস্ব সংবাদদাতা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কারো খবর আবার নামে ছাপা হয়, কোন পত্রিকায় লেখা হয় এলাকার নাম উল্লেখ করে। যেমন আজকের কাগজে লেখা হয় নরসিংদী প্রতিনিধি বা দিনাজপুর প্রতিনিধি, ভোরের কাগজে লেখা হয় ভোরের কাগজ প্রতিনিধি, ইত্তেফাকে লেখা হয় পাবনা সংবাদদাতা বা রংপুর সংবাদদাতা, এভাবে। সংবাদে নিজস্ব সংবাদদাতা ছাপা হয়। অবজারভারে 'আওয়ার ওন করসপনডেন্ট' লেখা হয়।

ঢাকার বাইরের এসব সংবাদদাতা (স্টাফ রিপোর্টার, নিজস্ব প্রতিনিধি বা জেলা বার্তা পরিবেশক ছাড়া) আজো কর্মরত সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃত নন। এরা অধিকাংশই প্রকাশিত খবরের লাইন ভিত্তিতে টাকা পান। যেমন ইত্তেফাকে একজন সংবাদদাতাকে প্রতি লাইনে খবরের জন্যে ১ টাকা করে দেয়া হয়, সংবাদে ৭৫ পয়সা। এছাড়াও রয়েছে লেখনী ভাতা, যাকে বলে রিটেনার এ্যালাউন্স।

একেক পত্রিকায় (যারা লেখনী ভাতা দেয়) হার একেক রকম। উদাহরণ হিসেবে ইত্তেফাকের কথা ধরুন। একজন সংবাদদাতার খবর ছাপা হলো ৪০০ লাইন, তিনি ৪০০ টাকা পাবেন, সেইসাথে লেখনীভাতা ৭৫০ টাকা। অর্থাৎ ১১৫০ টাকা। ছবি ছাপা হলে তার প্রতিটির জন্যে ৫০ টাকা পাবেন। এই তার আয়। খবর পাঠানোর জন্যে ফ্যাক্স টেলিফোন টেলিগ্রাম বিল আলাদা দেয়া হয়, তবে এতে হাতে কিছু থাকে না, কেননা ঐ টাকাটা খবর করতেই খরচ হয়। বুঝতেই পারছেন, একজন নিজস্ব সংবাদদাতা কত কম টাকা পান। তবু কাজ করে যাচ্ছেন। এটা একটা নেশার মতো হয়ে গেছে।

অনেকে দীর্ঘ বছর কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছেন, এখন আর অন্য কোন্ পেশায় যাবেন? সে পেশায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়াটা হবে মুশকিল।

প্রাপ্ত টাকা-পয়সা খুব কম বলে অধিকাংশ নিজস্ব সংবাদদাতা পূর্ণাঙ্গ বা খণ্ডকালীনভাবে অন্য পেশায় নিয়োজিত। কেউ আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যাংক বীমার কাজ করেন, কেউ টুকটাক ব্যবসা করেন। কেউ আবার ছাত্র।

www.pathagar.com

না, এটা ভাববেন না যে, সবগুলো পত্রিকাই তাদের নিজস্ব সংবাদদাতাকে লাইনেজ বিল, রিটেনার এ্যালাউন্স, ছবির বিল এসব দেন। অধিকাংশ পত্রিকা বঞ্চিত করছে তাদের নিজস্ব সংবাদদাতাদের। লাইনেজ বিল নয়, কেবল একখানা সৌজন্য সংখ্যা পত্রিকা, কিছু প্যাড, খাম দেয়া হয়। কোন কোন পত্রিকা কেবল তার সংবাদদাতাকে ফ্যাক্স, ফোন খরচটা দেয়, কাউকে শুধু একটা আইডেনটিটি কার্ড হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, নিয়োগপত্রও নেই।

আমার হিসেবে প্রতি একশ' নিজস্ব সংবাদদাতার মধ্যে ২০ জন মাত্র নিয়মিত লাইনেজ বিল, লেখনিভাতা পান। অবশিষ্টরা বিনা পয়সায় কাজ করে যাচ্ছেন। মনে করা হয় প্রচার সংখ্যা ভালো এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল অফিসগুলোই কেবল টাকা পয়সা দেয় তাদের সংবাদদাতাদের, আসলে সবার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি তা নয়। খুব বেশি সরাসরি বিজ্ঞাপন পায় এমন পত্রিকাও তাদের সংবাদদাতাদের ঠকায়। কেউ আবার টাকা পয়সা দিলেও মাসের পর মাস বাকি ফেলে রাখে। ৫শ' টাকা বিল তোলার জন্যে ৫শ' টাকা খরচ করে পঞ্চগড় থেকে ঢাকায় গিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকতে হয়।

পদমর্যাদা স্বীকৃত নয়, টাকা পান খুব কম, কিংবা একেবারেই পান না, তবু কেন তারা কাজ করেন? এর নানা কারণ। কেউ অপেক্ষা করেন সুদিনের। কেউ দীর্ঘদিন কাজ কর‍্যে করতে এমন একটা সামাজিক অবস্থানে এসে গেছেন যে, অন্য কোন পেশায় যেতে পারেন না। এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরে 'জনসেবা' করা হচ্ছে এমন ভাবেন কেউ, কেউ আবার সামাজিক সম্মান হিসেবে, 'সাংবাদিকতা' ধরে আছেন। এখানে ওখানে, অফিস কাচারিতে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাওয়া যায়, সাংবাদিক বলে লোকে জানে, মানে। তা সত্ত্বেও, অনেকে এই কাজ ছেড়ে দিয়েছেন।

ঢাকার বাইরের সংবাদদাতারা বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের সংগৃহীত খবর ঢাকায় পাঠান। আপনার জেলা শহরে রাত ১১টায় দুর্ঘটনা ঘটলো, মারা গেল ১০জন, এই খবরটি আপনি পরদিন সকালেই পেয়ে যাচ্ছেন আপনার প্রিয় পত্রিকায়। এটি এমন খবর যে, একটুখানি দেরি হলে বাসি হয়ে যাবে, ঐ রাতে না পাঠালে ২৪ ঘন্টা দেরি হয়ে যাবে, অন্য পত্রিকায় ছেপে দেবে, সে কারণে ত্বরিত পাঠাতে হয় খবরটি। খবরটি যায় ফ্যাক্সে বা ফোনে।

খবর পাঠানোর পদ্ধতিটি স্পষ্ট বোঝানোর জন্যে উদাহরণ দিচ্ছি : যেমন ধরুন '৯৫ এর ১৩ই জানুয়ারী হিলিতে ঘটলো ট্রেন দুর্ঘটনা, রাত সোয়া ৮টায়। পরদিন সকালে প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে প্রধান শিরোনাম হয়ে তা ছাপা হয়ে গেলো। আপনি ভাবলেন, হিলি একটি দূর সীমান্ত এলাকা, ফ্যাক্স নেই, টেলিফোন যোগাযোগ তেমন ভাল নয়, সেখানকার খবরটি কি করে দ্রুত পাঠাতে পারলেন সাংবাদিকরা?

না এক যোগে একই মাধ্যমে হিলির ট্রেন দুর্ঘটনার খবরটি ঢাকায় পৌঁছে নি, গেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে। দিনাজপুর থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা বের হয়, তার নাম উত্তরবাংলা, এর সম্পাদক মতিউর রহমান। ইনি আবার ইত্তেফাকের দিনাজপুর সংবাদদাতা, ওদিকে বাংলাদেশ টেলিভিশনেরও সংবাদদাতা।

হিলিতে (থানা হাকিমপুর) উত্তরবাংলার একজন নিজস্ব সংবাদদাতা আছেন, তিনি হিলি থেকে টেলিফোনে দুর্ঘটনার খববটি জানান উত্তরবাংলা অফিসে। হিলি থেকে

www.pathagar.com

ওটিডি টেলিফোন লাইন আছে দিনাজপুরে, সরাসরি কথা বলা যায়, সেকারণে দ্রুত খবরটি দিনাজপুর শহরের পত্রিকা অফিসে পৌছায়। উত্তরবাংলার মতিউর রহমান, তিনি খবরটি পেয়েই টেলিফোনে (NWD) টেলিভিশনের বার্তা বিভাগে জানান, ঐ রাতের সর্বশেষ বুলেটিনে খবরটি প্রচারিত হয়ে যায়। মতি ইত্তেফাকেও খবরটি পাঠিয়ে দেন। পরদিন প্রায় কাগজে ছাপা হয়। উত্তরবাংলায় তো ছাপা হয়-ই।

জনকণ্ঠ খবরটি পেলো কি করে? জনকণ্ঠে যে সংবাদদাতা কাজ করেন দিনাজপুর থেকে, তরুণ সাংবাদিক শিলু রহমান, তিনি আবার ঐ দৈনিক উত্তরবাংলার একজন রিপোর্টার। শিলুও হিলি থেকে খবরটি আসা মাত্র টেলিফোনে জনকণ্ঠে পাঠিয়ে দেন। ইনকিলাবে খবরটি পৌছায় অন্যভাবে। ঐ পত্রিকার দিনাজপুর সংবাদদাতা রাত এগারোটার পর যখন অফিস থেকে বাসায় ফিরছিলেন, তখন ঢাকা থেকে একটি টেলিফোন কল পান। ফোনটি করা হয় ইনকিলাব থেকে, টিভিতে প্রচারিত বুলেটিনে ট্রেন দুর্ঘটনার খবরটি শুনে। ইনকিলাবের সাংবাদিক মাহফুজুল হক আনাম ইনকিলাব অফিস থেকেই প্রথমে জানতে পারেন দুর্ঘটনার খবর। তিনি তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন সূত্রে যোগাযোগ করেন, হিলিতে ফোনে কথা বলেন এবং দুর্ঘটনা ও হতাহতের সর্বশেষ খবরটি ইনকিলাবে পাঠান।

এদিকে দেখুন, সংবাদে প্রকাশিত আমিনুল হক বাবুলের খবরটি গেছে দিনাজপুর থেকে নয়, অন্য জেলা থেকে, হাত ঘুরে। আমিনুল হক বাবুল সংবাদের জয়পুরহাট জেলা এলাকার নিজস্ব সংবাদদাতা। তিনি দুর্ঘটনার খবরটি পান জয়পুরহাটে। হিলি জয়পুরহাট শহর থেকে কাছাকাছি। খবর পেয়েই বাবুল তা বগুড়ায় টেলিফোনে জানান বগুড়ার জেলা বার্তা পরিবেশক হাসিবুর রহমান বিলুর কাছে। বিলু তা বগুড়া-ঢাকা সরাসরি (আইএসডি) টেলিফোন লাইনে 'সংবাদ' এ পাঠিয়ে দেন, পরদিন প্রধান শিরোনামের খবরটি আমিনুল হক বাবুলের নামে ছাপা হয়ে যায়। বগুড়ার করতোয়া, চাঁদনীবাজারসহ বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধি আছে হিলিতে, তারা হিলি থেকে ফোনে খবরটি পাঠান নিজ নিজ পত্রিকায়।

হিলি জায়গাটা ছোট হলেও সাংবাদিক অনেক, মোট ৩৭ জন। কিন্তু কেউই হিলি থেকে সরাসরি ঢাকায় দুর্ঘটনার খবরটি পাঠাতে পারেন নি।

কয়েকটি পত্রিকার মধ্যে দৈনিক জনতা প্রথম দিনে ট্রেন দুর্ঘটনার খবরটি মিস করে, হিলিতে জনতার একজন নিজস্ব সংবাদদাতা থাকা সত্ত্বেও। তিনি নাকি হিলি-ঢাকা টেলিফোন লাইন সংযোগ পান নি। কয়েকটি পত্রিকা হিলির খবরটি পান টিভির সর্বশেষ বুলেটিনটি শুনে। আগেই এক জায়গায় বলেছি যে, প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় টিভি ও রেডিও'র খবর শোনা হয়, রেকর্ডও করা হয়। এর কারণ গুরুত্বপূর্ণ দেশী বিদেশী কোন খবর যাতে মিস না হয়। জনতাতেও টিভির খবর শোনা হয়ে থাকে, কিন্তু ঘটনার দিন যে কারণেই হোক সর্বশেষ খবর শোনা হয় নি। হলে পরে বড় ধরনের সংবাদটি জনতা মিস করতো না।

ওপরের বর্ণনায় এটুকু নিশ্চয়ই পরিষ্কার হবে যে একটি খবর বিভিন্ন মাধ্যমে পেয়ে থাকেন ঢাকার বাইরের জেলা থানায় কর্মরত সাংবাদিকেরা এবং বিভিন্নভাবে তা নিজ

www.pathagar.com

নিজ পত্রিকায় পাঠান। কেউ স্পটে থেকেও খবর মিস করেন, আবার কেউ ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরের এলাকায় অবস্থান করেও তা কাভার করতে পারেন। এটা নির্ভর করে ঐ সাংবাদিকটির সংবাদ প্রাপ্তির উৎস কি রকম, তিনি কি কাজ করেন, সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা বা ফ্যাক্স যোগাযোগ ব্যবস্থার কাছাকাছি তিনি থাকেন কি-না।

'৯৫-এর ফেব্রুয়ারিতে সংবাদ এর প্রথম পাতায় একটি খবর খুব গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়, যার বিষয় ছিল, বুড়িমারী চেকপোস্টে পণ্য বোঝাই কয়েকশ ট্রাক আটকা পড়ে আছে, কাস্টমস বিভাগের হয়রানীমূলক আচরণের কারণে ট্রাকগুলো বাংলাদেশে আসতে পারছে না। বুড়িমারী একটি বড় স্থলবন্দর, ঐ রুটে মালামাল আসে প্রধানত ভূটান থেকে। ট্রাক আটকে থাকার এই খবরটি লালমনিরহাট সংবাদদাতা সংবাদে পাঠাতে পারেন নি, ধারে কাছের কোন জেলা থানার সাংবাদিকও পাঠাতে পারেন নি, পাঠিয়েছেন সংবাদের রাজশাহীস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা মলয় ভৌমিক।

তা কি করে এটা সম্ভব হলো? রাজশাহী আর লালমনিরহাট তো অনেক ফারাক, তাও আবার লালমনিরহাট শহরের খবর নয়, শহর থেকে প্রায় ১শ কিলোমিটার দূরের সেই পাটগ্রাম থানার বুড়ীমারী এলাকা। আসলে, ব্যাপারটি হয়েছিল কি, মলয় ভৌমিক ব্যক্তিগত কাজে এসেছিলেন সৈয়দপুরে, সৈয়দপুর থেকে তিনি লালমনিরহাটের পাটগ্রামে যান তিনবিঘা করিডোর দেখতে। ঐ করিডোরটি বুড়ীমারী থেকে কাছেই। করিডোর দেখতে গিয়ে তিনি ট্রাক আটকে পড়ে থাকার খবরটি পান এবং ঐদিনই সৈয়দপুরে ফিরে এসে ফ্যাক্সে খবরটি পাঠিয়ে দেন সংবাদে। পরদিন তা ছাপাও হয়ে যায়।

এসব অবশ্য ব্যতিক্রমী ঘটনা। সাধারণ যে খবর, যেমন দৈনন্দিন ঘটনা-দুর্ঘটনা, বিভিন্ন সমস্যার খবর, এসব সংগ্রহ করেন সাংবাদিকরা নিজ এলাকা থেকে এবং গুরুত্ব অনুযায়ী তা বিভিন্ন মাধ্যমে ঢাকায় পাঠান। কোন খবর যায় ফোনে, কোনটা ফ্যাক্সে, কোনটা কুরিয়ার সার্ভিসে, কোনটা আবার ডাকযোগে। অনেক সময় ঢাকাগামী কোন যাত্রীর হাতেও খবরের প্যাকেট দেন কেউ কেউ। এটা নির্ভর করে এলাকা-অবস্থানের ওপর।

ধরুন, ঘটনাস্থল সিলেট শহর। শেখ হাসিনা বিকেলে এক জনসভায় বক্তৃতা করেছেন। এই খবরটি ডাকে পাঠালে ঢাকায় যেতে দুদিন, সেক্ষেত্রে তা বাসি হয়ে যাবে, ছাপাই হবে না। তাই জনসভার খবরটি পাঠানো হবে টেলিফোনে বা ফ্যাক্সে। জনসভার ছবিও যাবে ফ্যাক্সে। একইভাবে, সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন মারা গেছে, চালের দাম হঠাৎ করে কেজি প্রতি দু টাকা বেড়ে গেছে, যান্ত্রিক কারণে বিমান নামতে পারে নি, দু'দল ছাত্র সংঘর্ষে দু'জন মারা গেছে এধরনের খবরগুলো ফোনে বা ফ্যাক্সে পাঠানো হয়ে থাকে। দেরি হলে এগুলোর আর গুরুত্ব থাকে না, কেননা অন্যসব পত্রিকা তো পরদিনই ছেপে দেবে। কিন্তু, মৌলিক বিষয়ের যেসব খবর, সে খবর দুদিন পরে পাঠালেও পরে যাবে না, সেগুলো ঢাকায় যাচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিসে বা ডাকযোগে।

www.pathagar.com

মনে করুন একজন সাংবাদিক লিখছেন সিলেট মেডিকেল কলেজের সমস্যার ওপর একটা স্টোরি, সঙ্গে ছবিও থাকছে, এটি কালই ছাপা না হলে বাসি হয়ে যাবে না। কেউ লিখছেন মাটির উর্বরা শক্তি হ্রাস পাওয়ার কারণে সিলেটে শস্যের ফলন বছরে বছরে কমে যাচ্ছে। কেউ লিখছেন সিলেট শহরে যানজট দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে। এগুলো ফোনে-ফ্যাক্সে পাঠানো হয় না, কুরিয়ারে, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির মাধ্যমে বা ডাকে প্যাকেট যায়। পরিচিত বিশ্বস্ত কেউ হয়তো বিমানে, ট্রেনে, বাসে ঢাকা যাচ্ছেন, তার হাতেও প্যাকেট দিয়ে দেয়া হয়, বাহক তা পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে দেন। বিমানেও প্যাকেট বুক করে দেয়া হয়, ঢাকা অফিস তা বিমানের মতিঝিল কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করে নেয়।

অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে পত্রিকা, পত্রিকার রিপোর্টারের পদ মর্যাদা, তার কাজের ধারা, কোন্ বিষয় নিয়ে রিপোর্ট তিনি লিখছেন, এসবের ওপর নির্ভর করে কোন্ মাধ্যমে খবরটি ঢাকায় যাবে। ইত্তেফাকের সিনিয়র রিপোর্টার হাসান শাহরিয়ার মাঝে মধ্যে সিলেট অঞ্চলে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশেষ রিপোর্ট লেখেন। তার স্টোরি ইত্তেফাক অফিসে পৌঁছুলে দু'চারদিন পড়ে থাকে না, খুব তাড়াতাড়ি ছাপা হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তিনি হয়তোবা প্যাকেটে দেয়া যায় এমন খবরও ফ্যাক্সে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সিলেট সংবাদদাতার কোন স্টোরি হলে তা হয়তোবা প্যাকেটে পাঠাতেন ঐ সংবাদদাতা। কি কি ধরনের খবর ফোনে, ফ্যাক্সে বা প্যাকেটে যায়, তা একদিনের 'সংবাদ' থেকে তুলে ধরছি যেমন :

সংবাদ : ৮ই মার্চ ৯৫

প্রথম পাতায় প্রকাশিত খবর : ঢাকার বাইরে থেকে আসা : আগাম বৃষ্টি না হলে দেশ পড়বে ভয়াবহ খরার কবলে। রাজশাহী থেকে পাঠানো মলয় ভৌমিকের খবর গেছে ফ্যাক্সে। নামে ছাপা হয়েছে।

গোপালগঞ্জে বাস খাদে : নিহত ৪, আহত ৪০

গোপালগঞ্জস্থ নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো খবর। পাঠানো হয়েছে টেলিফোনে।

উত্তরাঞ্চল ॥ মজুত থাকা সত্ত্বেও মোটা চালের দর আরো বেড়েছে। বগুড়া থেকে হাসিবুর রহমান বিলু এই প্রতিবেদনটি পাঠান ফ্যাক্সে, সেটি নামে ছাপা হয়।

সার সংকট : চাঁদপুরে বিশেষ দলের কর্মীদের পোয়াবারো। নিজস্ব সংবাদদাতা শাহ মোহাম্মদ মকসুদের পাঠানো খবর, নামে ছাপা হয়েছে, পাঠানো হয়েছে প্যাকেটে।

শেষ ফাল্গুনের বৃষ্টি : শীত। রংপুর ডেটলাইনে নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের খবর : পাঠানো হয়েছে রংপুর থেকে ফ্যাক্সে। মাদারীপুরে একজনকে জবাই করে হত্যা : মাদারীপুরের খবর পাঠানো হয়েছে টেলিফোনে। লালমনিরহাটে ইউরিয়া সারের তীব্র সংকট। নিজস্ব সংবাদদাতার খবর : পাঠানো হয়েছে টেলিফোনে।

মুন্সীগঞ্জে ব্যবসায়ীদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্ছিত : নিজস্ব সংবাদদাতার খবর : পাঠানো হয়েছে টেলিফোনে। যশোর : ঘুষের টাকা ফেরতের দাবীতে কর্মকর্তা ঘেরাও। নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের খবর : পাঠানো হয়েছে ফ্যাক্সে।

কুমিল্লার নুরুর রহমানের পাঠানো খবর : নারী-শিশু পাচারকারী হাজী-আমীর হোসেন গ্রেফতার : (ছবি আছে) পাঠানো হয়েছে বাহক মারফত।

www.pathagar.com

সিআইডি কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল থেকে ফিরেছেন ॥ মঞ্জুর হত্যা মামলা সংক্রান্ত মূল রিপোর্টের অংশ : চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক জসীম চৌধুরী সবুজ পাঠিয়েছেন ফ্যাক্সে।

ঢাকা-আরিচা রুটে শিশু ছিনতাইকারী : কল্যাণ সাহার রিপোর্ট লেখা হয়েছে ঢাকা অফিসের টেবিলে বসে।

শেষের পাতা :

নারায়ণগঞ্জে সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ৬, জেলা বার্তা পরিবেশকের রিপোর্ট, পাঠানো হয়েছে ফোনে। 'যে স্বাধীনতা পেয়েছি তাকে ধরে রাখতে হবে' প্রধান বিচারপতির খবর, খুলনা থেকে মানিক সাহা পাঠিয়েছেন ফ্যাক্সে।

উত্তরবঙ্গে মহিলা ক্ষেতমজুর মজুরি পায় খুবই কম। আমার লেখা স্টোরি, রংপুর থেকে পাঠানো হয়েছে ফ্যাক্সে।

৫-এর পাতা :

সিলেট বেতারে ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচার হয় নি : প্রচার হয় বিশেষ বুলেটিন। সিলেটের জেলা বার্তা পরিবেশক আল আজাদের খবর। ফ্যাক্সে পাঠানো হয়। প্রথম পাতায় স্পেস না পাওয়ায় পরদিন (৮ই মার্চ) ৫-এর পাতায় ছাপা হয়।

নীলফামারীতে চাল ও সারের দাম বৃদ্ধি। নীলফামারী জেলা বার্তা পরিবেশক খবরটি পাঠান টেলিফোনে ৬ই মার্চ। স্পেস না পাওয়ায় পরদিন ৫-এর পাতায় ছাপা হয়।

এই খবরের সাথে ঠাকুরগাঁও এলাকার সারের দর পরিস্থিতির ওপর নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট ছাপা হয়েছে, এটা পাঠানো হয়েছে ঠাকুরগাঁও থেকে ফোনে।

সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু। রংপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো খবর। ফ্যাক্সে পাঠানো হয় কিন্তু প্রথম পাতায় স্পেস না পাওয়ায় ৫-এর পাতায় ছাপা হয়েছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আগামীকাল খুলছে। ময়মনসিংহ নিজস্ব সংবাদদাতার ফ্যাক্স। স্পেস না পাওয়ায় একদিন পর ছাপা হয়।

চট্টগ্রাম : ভেজাল ঘি তৈরির কারখানা আবিষ্কার, চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের খবর ফ্যাক্সে পাঠানো হয়।

দিনাজপুরস্থ নিজস্ব সংবাদদাতার খবর : কয়লাখনি প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য নির্ধারণে অনিয়মের অভিযোগ : প্যাকেটে পাঠানো হয়।

মনোহরদী : ছাত্রী উপবৃত্তি নিয়ে দুর্নীতি চলছে, কেশবপুর : তিন বছরে পাঁচটি থানায় চরমপন্থীদের হাতে খুন হয়েছে ৩৫ জন, সিরাজগঞ্জ হাসপাতালের চিকিৎসা সুবিধা ভেস্তে যেতে বসেছে।

মির্জাপুর : দশ বছরেও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মিত হয় নি

পটুয়াখালীতে লাশ উদ্ধার,

নাটোরে ভারতীয় চিনি উদ্ধার,

মোহনগঞ্জের হাওড় অঞ্চলে দাদনের ব্যবসা জমজমাট, বান্দরবনে কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির বেতন ভাতা পদ্ধতি প্রবর্তন

www.pathagar.com

চাঁদপুর : পৌরসভার চেয়ারম্যান কমিশনারদের শপথ গ্রহণ

দোহাজারী : সাতটি থানায় মাছের ক্ষতরোগ দেখা দিয়েছে,

গাজীপুরে আওয়ামী লীগের কর্মিসভা

গৌরিপুরে চালের দাম কমে নি

ভুলের মাশুল, কিশোরগঞ্জ নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো খবর : পাঠানো হয়েছে ডাকযোগে। মনোহরদীর খিজিরপুর পোস্ট অফিসে ডাক পিওন সেই নিজস্ব সংবাদদাতার খবর।

এসব খবর প্যাকেটে বা ডাক যোগে পাঠানো হয়।

কাল সারাদেশে সাংবাদিক সমিতির দাবী দিবস।

এই খবরটি প্রেস রিলিজ থেকে লেখা।

৮ই মার্চ '৯৫ সংবাদ-এ ঢাকার বাইরের এলাকার খবর সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ও বেশি জায়গা (স্পেস) নিয়ে ছাপা হয়। দেখা যায় : প্রথম পাতার খবরগুলো, ফ্যাক্সে ফোনে প্যাকেটে এসেছে। কোন খবর আবার সংবাদদাতা ঢাকায় গিয়ে লিখেছেন। ভেতরে পাতায় ছাপা হয়েছে ফ্যাক্স ফোন প্যাকেট ডাকযোগে প্রাপ্ত ছোট বড় ২৩ খবর।

ফ্যাক্সে বা ফোনে কোন খবর পাঠালেই যে পরদিন তা প্রথম পাতায় ছাপা হয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। কেননা এটা নির্ভর করে খবরের গুরুত্ব কেমন, ঐদিন প্রথম পাতা পাওয়া, স্পেস পাওয়া যাবে কিনা এসবের ওপর। আবার, প্যাকেটে খবর পাঠালে তা যে ভেতরের পাতায় ছাপা হবে, তা-ও নয়। বার্তা সম্পাদক যদি বিবেচনা করেন যে, প্রাপ্ত খবরটি প্রথম পাতায় ছাপার যোগ্য, সেটি প্রথম পাতায় ছাপাবেন তিনি। তবে, এর ব্যতিক্রমও কখনো সখনো ঘটে। যেমন ধরুন একটি খবর, বার্তা সম্পাদক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রথম পাতায় ছাপবেন, সেভাবেই ডামিতে বসিয়ে দিলেন, কিন্তু গভীর রাতে এমন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর এসে পড়লো যে, সেটি সরিয়ে (একসেস করে) রাখা হলো। পরদিন আবার তা (গুরুত্ব অনুসারে) প্রথম পাতায় বা ভেতরের পাতায় ছেপে দেয়া হলো। এটা সম্পাদনার ব্যাপার।

খবরের বিষয়, ঘটনার এলাকা, ব্যক্তিত্ব, পাঠক চাহিদা, এগুলোর ওপর নির্ভরশীল। ৫-এর পাতায় প্রকাশিত হয়েছে রংপুরের খবর : সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু। দু'দিন আগে খবরটি ফ্যাক্সে পাঠালেও স্পেস পাওয়া যায় নি, একসেস হয়ে যায়। পরদিন তা প্রথম পাতায় ছাপার মতো নয় বলে বার্তা সম্পাদক তা ভেতরের পাতায় দিয়েছেন। এমন হতে পারতো যে, ঐদিন, যেদিন দুর্ঘটনা ঘটে এবং খবরটি পাঠানো হয়, সেদিন গোটা দেশে আরো ৫টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে, সব মিলিয়ে ৩০ জন মারা গেছেন, তাহলে হয়তো সবগুলো দুর্ঘটনার খবর একত্র করে তাতে 'রংপুরে ৪ জন মৃত্যু' খবরটিও ছাপা হতে পারতো।

একটি খবর প্রথম পাতায় ছাপা হোক, বা ৫-এর পাতায় হোক, তা খবরই। ভেতরের পাতায় ছাপা হলেই যে তা অবমূল্যায়ন করা হয়েছে, কিংবা তা পাঠকে পড়বেন না, কিংবা বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না, কিংবা তাতে রিডিং মেটেরিয়াল নেই, তা কিন্তু নয়।

www.pathagar.com

আজকাল বেশ কয়েকটি কাগজে ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ খবর ভেতরের পাতায় ছাপা হচ্ছে, এমনকি জাতীয় সংবাদও ভেতরের পাতায় ছাপা হচ্ছে। কোন্ ধরনের খবর প্রথম পাতায় যাবে, কোন্‌টি পেছনের পাতায় বা ভেতরের পাতায় যাবে, সেটি তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করেন ঐ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক। তবে কোন কোন খবরের ক্ষেত্রে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কিংবা সম্পাদকের পূর্ব-পরিকল্পনা থাকে, সে অনুসারে নির্দেশও থাকে। পত্রিকার পলিসি সংক্রান্ত ব্যাপারও কখনো কখনো বিশেষ বিষয়ের ওপর কোন খবর পরিবেশনার ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়।

ঢাকার বাইরের খবরগুলো পরিবেশনার ব্যাপারে একেক পত্রিকার একেক রকম স্টাইল রয়েছে। কোন পত্রিকায় দেখবেন ঢাকার বাইরে কোন বড় ঘটনা- দুর্ঘটনা ঘটলে তার খবর প্রথম পাতায় দেয়া হয়, আরসব চলে যায় ভেতরের পাতায়। কেউ আবার পরিবেশনা ভঙ্গির গুণে খুব ছোট ঘটনাও প্রথম পাতায় ছাপেন। এটা অবশ্য অনেকাংশে নির্ভর করে ঐ পত্রিকার ঢাকার বাইরের সংবাদদাতারা কতোটা খবর সংগ্রহ, লেখা ও তা পাঠানোর ব্যাপারে তৎপর, দক্ষ, এবং তার পরিবেশনা কৌশলটি কি রকমের, তার ওপর। খবরটি কোন্ সময়ে সৃষ্টি হয়েছে, রিডিং মেটেরিয়াল আছে কতোটা, পাঠক কিভাবে রিএ্যাক্ট করবে, এসব ব্যাপার-বিষয়ও নির্ণয় করে একটি খবর কোন্ পাতায় কিভাবে পরিবেশিত হবে।

মনে করুন : জামালপুরের গ্রামে চালের দাম হঠাৎ করে বেড়ে প্রতি কেজি ২০ টাকায় উঠেছে। নিশ্চয়ই এটি একটি খবর। কিন্তু পত্রিকা অফিসে পড়লেই এটি কি ছাপা হয়ে যাবে? সরকারি নিয়ন্ত্রণে বের হয় একটি পত্রিকা, সেটি নিশ্চয়ই ছাপবে না ২০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রির এ খবরটি। একটি পত্রিকার মালিক হয়তোবা খাদ্যমন্ত্রীর স্ত্রী কিংবা তার কোন আত্মীয়স্বজন, সে পত্রিকাতেও চালের দাম বেড়ে যাবার খবরটি আপনি নিশ্চয়ই ছাপার অক্ষরে দেখার আশা করবেন না। আবার কোন পত্রিকা হয়তো এরকম মনে করবে যে, জামালপুরের গ্রামে চালের দর ২০ টাকায় উঠেছে, এমন খবর ছাপা হলে দেশের আরসব এলাকাতেও তার (খবরটির) প্রভাব পড়বে, সব খানে চালের দর বেড়ে যাবে, মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়বে।

আবার, কোন কাগজ মনে করবে যে, চালের দাম বেড়ে যাবার খবরটি ছাপিয়ে দিয়ে খাদ্য বিভাগ তথা সরকারকে একটা বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়া যাক, আবার এমনো কেউ ভাববেন যে, আসলেই খবরটি গুরুত্বের সাথে ছাপা হওয়া দরকার একারণে যে, খাদ্য বিভাগ দ্রুত একটা এ্যাকশনে যাক, কি কারণে জামালপুরের গ্রামে চালের দাম ২০ টাকায় চড়ে গেল তা খতিয়ে দেখুক। মূল্যবৃদ্ধির ঐসব জনপদে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য পাঠাক এবং খোলাবাজারে চাল বিক্রি শুরু করে মূল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনুক। চালের মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য সংকট, দুর্ভিক্ষাবস্থা, অনাহারে মৃত্যু, সাম্প্রদায়িক দাংগা, এসব খুব স্পর্শকাতর বিষয়ের খবর, একেক কাগজ একেক রকমভাবে নেবে, কেউ ছাপবে, কেউ ছাপবে না।

কিন্তু চাঁদপুরে লঞ্চডুবিতে ২শত যাত্রীর প্রাণহানির আশঙ্কা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষে ২০ জন হতাহত, সড়ক দুর্ঘটনায় দিনাজপুরে ১০ জনের মৃত্যু, এ ধরনের

www.pathagar.com

দুর্ঘটনার খবর জন প্রতিক্রিয়া সাধারণত যেখানে নেতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে না, সেগুলো খবর ছোট করে হোক বা বড় করে হোক, সরকারী প্রচারমাধ্যম বা কোন বিরোধীদলের মুখপাত্র বা 'নিরপেক্ষ' কথিত পত্রিকা হোক, সবগুলোতেই ছাপা হবে।

তবে, তার আগে প্রশ্ন থাকবে, ঐ খবর পত্রিকার রিপোর্টার সংগ্রহ করতে পারবে কিনা, পারলে কতোটা সঠিকভাবে লিখবে, লিখলে তা পাঠাতে পারবে কি-না, কখন খবরটি পত্রিকা অফিসে পৌছুবে।

এসব নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে সেটি প্রথম পাতায় ছাপা হবে, নাকি পরদিন ভেতরের পাতায় যাবে।

ধরুন, এরকম একটি খবর সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রচণ্ড শীতে লালমনিরহাটে মারা গেছে ৪০ জন। এই খবর প্রায় সব পত্রিকাতেই পরদিন প্রথম পাতায় ছাপা হবার কথা বেশ বড় করে। কিন্তু তা আপনি দেখতে পেলেন না, দেখলেন খবরটি ছাপা হয়েছে মাত্র দুটি পত্রিকায়। কি এর কারণ? কারণ হতে পারে অনেক। যেমন :

১. শীতে ৪০ জন মারা গেছে সে খবর সংগ্রহ করতে পেরেছেন কেবলমাত্র ঐ দুজন রিপোর্টারই।

২. খবরটি ৪টি পত্রিকার চার জন সংবাদদাতা পেয়েছেন এবং যথাসময়ে পাঠিয়েছেন, কিন্তু দুটি পত্রিকার বার্তা সম্পাদক খবরটি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নি, সে কারণে কেবল দু'টি পত্রিকাতেই তা ছাপা হয়েছে।

৩. হতে পারে শীতে মৃত্যুর ঐ খবরটি দু'জন সংবাদদাতা ঢাকায় পাঠানোর পর অপর দু'জন টেলিফোন সংযোগ পান নি, কেননা ঐ সময় এনডাবলুডি চ্যানেলে গোলযোগ দেখা দেয়, কিংবা ঢাকার অফিসের টেলিফোন ঐ সময় অচল ছিল, সে কারণে কেবল দুটি পত্রিকাতেই খবরটি ছাপা হয়েছে।

৪. এমন হতে পারে যে, তিনজন সংবাদদাতা খবরটি পান, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মনে করেন যে, খবরটি কতোটা সত্য তা খতিয়ে দেখার জন্যে আগামীকাল গ্রামে (ঘটনাস্থলে) যাবেন এবং সে কারণে তিনি খবরটি ঐদিনই তার পত্রিকায় পাঠান নি।

৫. এমন হতে পারে, খবরটি তিনজন সংবাদদাতা পান, তিনজনই ঢাকায় পাঠান, কিন্তু একটি পত্রিকার বার্তা সম্পাদক খবরটি হাতে পেয়ে এরকম মনে করেছেন যে, শীতে ৪০ জনের মৃত্যুর ব্যাপারটি লালমনিরহাট জেলা প্রশাসনে ফোন করে চেক করে নেয়া হোক, কিন্তু চেক করতে গিয়ে দেখা গেছে জেলা প্রশাসক শীতে মৃত্যুর কথা পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন, সে কারণে খবরটি সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় রেখে দেয়া হয়েছে, বাকি দু'জনের খবর পরদিন ছাপা হয়ে গেছে।

৬. এমন হতে পারে যে, তিনজনের মধ্যে একজনের খবর এমন সময় অফিসে এসে পৌছেছে যে, তখন আর খবরটি কম্পোজ করানোর অবকাশ নেই। কেননা ইতোমধ্যেই প্লেট তৈরি হয়ে ছাপার জন্যে চলে গেছে। ইত্যাদি।

অবশ্য, শীতে ৪০ জন মারা যাবার খবরটি কতোটা বিশ্বাস করলেন আপনি সেটাও একটা প্রশ্ন। দুটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এ খবরটি, আপনি তা পড়লেন একটিতে,

www.pathagar.com

বিশ্বাস করলেন, মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন হলেন, সরকার কেন ঐ এলাকার শীতার্তদের জন্যে কম্বল পাঠাচ্ছেন না এই নিয়ে মনের খেদ ঝাড়লেন, রাজনীতি সচেতনতার কারণে সরকারি ব্যর্থতার কথা ভাবলেন, সামাজিক কোন সংগঠন করলে আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন ঐ এলাকায় গিয়ে গরম কাপড় বিতরণ করবেন।

এক কথায় খবরটি ছাপার আকারে আপনার সামনে আসবার পর নানাভাবে আপনাকে তা রিএ্যাক্ট করলো। তবে, এমন হতে পারে যে, আপনি নিজেও খবরটি বিশ্বাস করলেন না নানা কারণে। যেমন :

১. খবরটি কেবল একটি পত্রিকায় ছাপা হলো কেন?

২. ৪০ জন মারা যাওয়ার মতো বিরাট ঘটনার খবরটি মাত্র একজন রিপোর্টার পেলেন এবং তিনিই কেবল পাঠালেন, এটা কিভাবে সম্ভব হলো?

৩. লালমনিরহাটে তাপমাত্রা (সর্বনিম্ন) কতোতে নেমে এসেছিল যে ৪০ জন মারা গেছে।

৪. লালমনিরহাটের আশে পাশে আছে কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, রংপুর এসব জেলা, নিশ্চয়ই তাপমাত্রা ঐ সব এলাকাতেও নেমে এসেছিল, কিন্তু সেখানে ব্যাপক-সংখ্যক লোক শীতে মরলো না, কেবল লালমনিরহাটে মরলো কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটি পত্রিকার ঢাকা অফিসে যেভাবে প্রেস বিজ্ঞপ্তি আসে, বয়ে এনে দিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিংবা তার বাহক, তেমনি বিভিন্ন জেলা-থানায় নিয়োজিত সাংবাদিকরা এলাকার কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্মকাণ্ড, অনুষ্ঠান, ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ওপর প্রেসবিজ্ঞপ্তি পান। এসব আসে পত্রিকার আঞ্চলিক বা ব্যুরো অফিসে, আসে প্রেসক্লাবে, কোনটা আবার এককভাবে সাংবাদিকের হাতে তুলে দেয়া হয়। কোথাও কোন অনুষ্ঠান হলে সাংবাদিকরা আমন্ত্রণপত্র পান। তাছাড়া আর সব সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাকে যোগাযোগ রাখতে হয় প্রতিষ্ঠান বা সূত্রের সাথে, অনেকক্ষেত্রে আবার সূত্রই যোগাযোগ করে সাংবাদিককে বা সাংবাদিকদের খবর দেন। কিছু অনুষ্ঠান আছে যেগুলোতে যাওয়া নির্ভর করে আমন্ত্রণপত্রের ওপর, আবার কোনটার জন্যে আমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষার অবকাশ থাকে না। একটি জেলা শহরে আওয়ামী লীগ কর্মী সমাবেশ এবং ইফতার পার্টির আয়োজন করেছে, সেখানে একজন সাংবাদিক সাধারণত যাবেন না আমন্ত্রণ না পেলে কিংবা পূবাহ্নে অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পর্কিত কোন প্রেসবিজ্ঞপ্তি না দিলে।

কিন্তু যদি এমন হয় যে, শেখ হাসিনা ঐ ইফতার পার্টিতে উপস্থিত থাকবেন। সেক্ষেত্রে আবার আমন্ত্রণ করা না করা গৌন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, সাংবাদিকরা অনুষ্ঠানে হাজির থাকেন এজন্যে যে, শেখ হাসিনা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলছেন কি-না। একইভাবে যেখানে খবর সৃষ্টি হতে পারে, নিজের কাজের গরজেই হাজির হন একজন সাংবাদিক কিংবা সংশ্লিষ্ট সূত্রের সাথে যোগাযোগ রাখেন।

তবে যে সব রিপোর্ট হয় মৌলিক বিষয়ের ওপর, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যাচাই করে দেখবার জন্যে সরেজমিনে যেতে হয়, সেগুলোর সংবাদ সংগ্রহ পদ্ধতি ভিন্ন।

সাংবাদিক নিজেই প্রতিবেদন পরিকল্পনা করেন, কোন্ কোন্ মহলে বা কোন্ কোন্ সূত্রের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তা ঠিক করে নেন, পরবর্তী পর্যায়ে সেভাবেই

www.pathagar.com

নোটবুকে তুলে আনেন তথ্য-উপাত্ত। খবর লেখেন তিনি, গুরুত্ব অনুযায়ী পাঠিয়ে দেন সেটি পত্রিকায়, ফোনে ফ্যাক্সে বা প্যাকেটে সংবাদ সংগ্রহের পর্যায়ে একজন সাংবাদিক হাতে পেলেন তিনটি বিষয়ের খবর। শহরতলীর একটি মহল্লায় ডায়রিয়ায় মারা গেছেন ১০ জন, সামনের রোজার মাসে জিনিপত্রের দাম ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার জন্যে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, শহরের কাঁচাবাজারে ড্রেন না থাকায় ক্রেতা-বিক্রেতা দুই-ই দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। এই তিন ধরনের খবরই হয়তোবা ছাপা হবে, কিংবা সাংবাদিক প্রথমটি পাঠাবেন সেদিনই, ফ্যাক্সে বা ফোনে, পরের দুটি যাবে কুরিয়ার সার্ভিস বা ডাকযোগে। এবং এমনটিই হয়ে থাকে।

তবে, পত্রিকা প্রকাশের স্থান ভেদে ঐ তিনটি সংবাদের প্রকাশ, পরিবেশনার ভঙ্গি, এসবের হেরফের ঘটে থাকে। কোন আঞ্চলিক বা স্থানীয় দৈনিকে হলে একই দিনে সংগৃহীত ঐ তিনটি খবর, যা স্থানীয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো একই দিনে হয়তোবা পরিবেশন করবেন সাংবাদিক এবং তা ছাপাও হবে। অন্য খবরের চাপ না থাকলে ডায়রিয়ায় ১০ জনের মৃত্যু সংবাদ প্রধান শিরোনামে হতে পারে, আবার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতির আহবানটিও প্রথম পাতায় গুরুত্বের সাথে ছাপা হতে পারে।

ঢাকার বাইরের সংবাদ, যাকে বলা হতো মফস্বলের সংবাদ, সংবাদকর্মীকে বলা হতো মফস্বলের সাংবাদিক, এখন ক্রমশ অনেকটাই কেটে গেছে তা। রাজধানী থেকে একটি পত্রিকা বেরুলেও তার মোট পাঠক সংখ্যার অধিকাংশই রাজধানীর বাইরের। এদের চাহিদার দিকটি পত্রিকা কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সাথে দেখছেন। দেশে শিক্ষা-সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন পাঠক সৃষ্টি হচ্ছে, পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বাড়ছে, তাদের চাহিদাও বাড়ছে। বিদেশের খবর আর রাজধানীভিত্তিক খবরেই পাঠক সন্তুষ্ট নন, তারা চান দেশের খবর জানতে। জানতে চান গাঁও-গ্রামের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক- সামাজিক কর্মকাণ্ডের খবর।

অপরদিকে, মানুষের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি, রাজনৈতিক তৎপরতার রূপ-পরিবর্তন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা, শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, সড়ক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, তথা সামাজিক পালাবদলের কারণে সংবাদপত্র মালিকপক্ষ বা প্রকাশক পক্ষও চাচ্ছেন, দেশের সকল স্থানের খবরাখবর তারা পাঠকদের সামনে পরিবেশন করবেন, তাদের চাহিদা মেটাবেন।

একারণে, আগের দিনের মতো কেবল রাজধানী কেন্দ্রিক সংবাদ, বিদেশী সংবাদ, এসবই কেবল ছাপছেন না তারা, গুরুত্ব অনুযায়ী দিচ্ছেন দেশের আর সব নগর, অঞ্চল, জেলা-থানায় ঘটে যাওয়া ঘটনা দুর্ঘটনার খবর, বহু বিষয়ের ওপর মৌলিক প্রতিবেদন।

কয়েক বছর আগেও, এমন পরিস্থিতি ছিল যে, রাজধানীর রাস্তায় যানবাহনের ধাক্কায় দু'জন পথচারী আহত হলেও তা প্রথম পাতায় ছাপা হতো আর সেই অনেক দূরের পঞ্চগড়ে ডায়রিয়ায় ১০ জন মারা গেলেও তা মফস্বলের সংবাদ হিসেবে ভেতরের পাতায় ঠাঁই পেতো। সে অবস্থাটা কেটে গেছে বেশ ক'টি পত্রিকার ক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

এখন, ঘটনা যদি খুব বাসি হয়ে না যায় তাহলে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বগুড়া, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর এমনকি ছোট জেলা থেকে সৃষ্ট জাতীয় কোন বড় ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কিত খবর প্রথম পাতায় আসে।

পত্রিকা কর্তৃপক্ষের পুরাতন মানসিকতা, নীতি, এসব যেমন পাল্টেছে, তেমনি আবার এটাও ঠিক যে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় অনেক দূর অঞ্চলের খবরাখবর দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে ঢাকায়, পৌঁছুচ্ছে দৈনিক পত্রিকা বের হয় এমন সব বিভাগীয় ও জেলা শহরে।

টিএন্ডটি এখন বিভিন্ন বড় শহরের পাবলিক কল অফিসে ফ্যাক্স মেশিন বসিয়েছে, তাছাড়াও কোন কোন স্থানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চালু হয়েছে আইএসডি ফোন-ফ্যাক্স, এতে করে সাংবাদিকরা খবর পাঠাতে পারছেন অল্প খরচে, দ্রুত। কয়েকটি পত্রিকা তাদের আঞ্চলিক অফিস, ব্যুরো অফিস বা প্রতিনিধির বাসায় দিয়েছেন ফ্যাক্স মেশিন। যাদের ফ্যাক্স সুবিধে নেই তাদের কারো কারো বাসায় রিং বা নির্দিষ্ট কোন টেলিফোনে 'রিং ব্যাক' করা হয়ে থাকে ঢাকা অফিস থেকে।

অথচ কয়েক বছর আগেও, যখন আজকের মতো এন ডাবলুডি সিস্টেম ছিল না, তখন প্রতিনিধিদের ঢাকায় টেলিফোন কল বুক করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হতো, তারপর একসময় ব্যর্থ হয়ে খবর পাঠাতে হতো পরদিন ডাকযোগে। টেলিগ্রাম পাঠানোর জন্যে টেলিপ্রিন্টার মেশিন ছিল, তারও আগে ছিল মোর্স (টরে টক্কা) সিস্টেম, এতে প্রেস টেলিগ্রাম পাঠাতে খরচ লাগতো কম, জরুরি ভিত্তিতে ডেলিভারিও দেয়া হতো, কিন্তু টেলিগ্রামগুলো ইংরেজীতে লিখতে হতো বলে অনেক সাংবাদিক অসুবিধায় পড়তেন।

এমনও হতো যে, একজন একটা খবর ড্রাফট করতেন, তা-ই কপি করে পাঠাতেন পাঁচ-সাত জন, নিজ নিজ পত্রিকায়। এতে একই খবর কেবল অনুবাদের কিছু হেরফেরে একাধিক দৈনিকে ছাপা হতো। একজন যা লিখতেন তা প্রায় সবাই পাঠানোর কারণে সংবাদ লিখন, ভাষা ব্যবহার, তথ্য-উপাত্ত পরিবেশন, পরিবেশনের দৃষ্টিভঙ্গি, এসব ক্ষেত্রে সংবাদ লেখকের ব্যক্তি ইচ্ছাটাই প্রতিফলিত হতো বেশি।

কোন কোন জেলা শহরের প্রেসক্লাবে এমন দৃশ্য দেখা যেতো যে, যারা নিজে প্রেস টেলিগ্রাম ড্রাফট করতে অক্ষম তারা বিকেল থেকে অপেক্ষা করে বসে আছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যিনি ভালো ইংরেজী লিখতে পারেন, তার জন্যে। অথচ, তখন সংবাদ লেখক হয়তো বাসায় নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন বা কোথাও আড্ডা পিটছেন।

আজ সরাসরি টেলিফোন সংযোগ, ফ্যাক্স, এসব সুবিধা সম্প্রসারিত হওয়ায় যার যেমন ইচ্ছা লিখতে পারছেন, যখন খুশি পাঠাতে পারছেন। ইচ্ছে হলে খবর বড় করে লিখছেন, ইচ্ছে করলে ছোট করে লিখছেন। কেউ সন্ধ্যায় খবরটি ডেসপ্যাচ দিচ্ছেন কেউবা দিচ্ছেন রাত দশটা-এগারোটায়।

অবশ্য, সাংবাদিকরা যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলি, অনেকে হয়তো স্বীকার করবেন যে, আগের দিনে কোন ঘটনা, দুর্ঘটনায় লোকজন মারা গেলে, সম্পদের ক্ষতি হলে সব কাগজে মোটামুটি একই ধরনের পরিসংখ্যান বের হতো, কেননা,

www.pathagar.com

প্রেরিত প্রেস টেলিগ্রাম ড্রাফট করতেন পাকা হাতের একজন কিংবা দু'জন। এতে পাঠক তথ্য বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচতেন। আজকের দিনে বাংলায় খবর লেখা, যার যা সংগ্রহ করা তথ্য অনুসারে সংবাদ লেখার ফলে এক কাগজ থেকে আরেক কাগজের তথ্য পরিসংখ্যান গরমিল হামেশাই হচ্ছে। একই সড়ক দুর্ঘটনায় কেউ পাঠাচ্ছেন ১০ জন মারা গেছে, কেউ পাঠাচ্ছেন ১২ জন মারা গেছে, কেউ লিখছেন ১৫ জন মারা গেছে। এ যেন বেশি মৃত্যু দিলেই তার খবরটি বেশি গুরুত্ব পাবে। কিন্তু পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি মোটেই আমল পাচ্ছে না।

ঢাকায় যেমন, অফিস বা প্রতিষ্ঠান থেকে কোন খবরের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় অনেক ক্ষেত্রে টেলিফোনে, তেমনটি আজকাল ঢাকার বাইরের ছোট বড় শহরগুলোতেও হচ্ছে। অফিসে বসে খবর নিচ্ছেন। কেউ বাসায় বসে খবর নিচ্ছেন। তবে সামগ্রিক সংগ্রহ চিত্র এরকম নয়। অনেক সাংবাদিক আছেন যারা সরাসরি ঘটনাস্থলে বা সূত্রের কাছে যাচ্ছেন।

আগের দিনে 'জানা গিয়াছে; প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ' এ ধরনের খবর ছাপা হতো। দু'দশক আগে এরকম খবর পাঠ করেছেন যে, 'এসডিও সাহেবের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করিলে তিনি জানান গতকাল . . . শহরে বৃষ্টিপাত হইয়াছে।'

'মাজরা পোকার আক্রমণে হাজার হাজার একর জমির পাট গাছ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।'

'অভিযোগে জানা যায় দুইটি বাস মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হইলে ৩জন যাত্রী নিহত হয়।' ইত্যাদি।

আজকের আধুনিক সংবাদপত্রের দিনেও, ভুলভ্রান্তির অবসান পুরোপুরি না ঘটলেও, সংবাদ সংগ্রহ, সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞান, লেখার স্টাইল, ভাষা ব্যবহার, পরিবেশনা ভঙ্গি, এসবে ব্যাপক পালাবদল ঘটেছে। শহরে বৃষ্টি হয়েছে কিনা এটা প্রশাসনিক কর্মকর্তার মুখ থেকে শুনে লেখা হয় না, সাংবাদিক নিজেই বৃষ্টি হওয়া দেখে লেখেন, প্রয়োজনে আবহাওয়া দফতরে যোগাযোগ করে জেনে নেন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কতো, কৃষি বিভাগ থেকে জেনে নেন এই বৃষ্টি ফসল চাষাবাদের ক্ষেত্রে শুভ হবে নাকি অশুভ হবে।

ধান বা আখের মতো পাট গাছে যে মাজরা পোকা হয় না, তা জানেন এমন সাংবাদিক।

দুটি বাস মুখোমুখি 'সংঘর্ষে লিপ্ত হয়' এরকম বাক্য লেখা বা ভাষা ব্যবহার চোখে পড়ে না।

বরং অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সংবাদ ফিচার লেখার মান যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। অনুসন্ধান প্রতিবেদন সরেজমিন প্রতিবেদন এসব বেশি হচ্ছে। খবরের বিষয় হিসেবে নিত্যদিনের ঘটনা দুর্ঘটনা কেবল নয়, নানান মৌলিক বিষয় উঠে আসছে। অফিসের টেবিলে সম্পাদনাও হচ্ছে খুব দক্ষতার সাথে। উচ্চ শিক্ষিত এবং তরুণ যুবকরা ঢাকার বাইরের সাংবাদিকতায় এসেছেন, এদের অনেকে বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকেও কৃষি, ভূমি ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং উন্নয়ন সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

www.pathagar.com

কয়েক বছর থেকে দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি পত্রিকা তাদের প্রতিনিধিদের এসাইনমেন্ট দিয়ে প্রতিবেদন লেখাচ্ছেন বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর। কোন খবর মিস করলে জবাবদিহি করতে হচ্ছে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কাছে। এছাড়াও, খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীর খবর, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বড় ধরনের দুর্ঘটনা, এমন হলে পরে ঢাকা থেকে পাঠানো হচ্ছে স্টাফ রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার। এটা ঠিক যে, এতে করে কেউ কেউ হীনম্মন্যতায় ভুগছেন, ভাবছেন এ খবরতো আমি লিখতে পারতাম, ঢাকা থেকে রিপোর্টার পাঠানো কেন?

দ্বিতীয়ত অনেকক্ষেত্রে সদর এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে পরিচিত না হওয়ায় কোন কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতিবেদনে তথ্য বিভ্রান্তি ঘটছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, জেলা শহর ও গ্রামীণ পর্যায়ের সংবাদকর্মীরা এতে উপকৃতও হচ্ছেন। দ্রুত খবর সংগ্রহের কাজ, লেখার কৌশল, পাঠানোর পদ্ধতি, এসব লিখতে পারছেন তারা, নতুন সংবাদকর্মীদের জন্যে এটা প্রশিক্ষণের মতো হচ্ছে। টিমওয়ার্ক ধরনের কাজ হচ্ছে, ভাবের আদান প্রদান হচ্ছে, সখ্য গড়ে উঠেছে মহানগরীর সাংবাদিকতা আর জেলা থানা জনপদের সাংবাদিকতার মধ্যে, ফারাকটা একটু একটু দূর হচ্ছে। কয়েকটি পত্রিকায় আঞ্চলিক পর্যায়ের সাংবাদিক রয়েছেন এবং তারাও নিজ নিজ কর্ম এলাকার শহর গ্রাম সফর করে জেলা থানা পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে সংবাদ সংগ্রহ করছেন। এক বা একাধিক প্রতিনিধির চিন্তা ও মত বিনিময়ের ফলে নতুন নতুন মৌলিক বিষয় আসছে, প্রতিবেদনের গ্রন্থনা তথ্য সমৃদ্ধ ও শক্তভিত্তির হচ্ছে।

একত্রে কিভাবে কাজ হচ্ছে দেখুন, '৯৫ এর ১৩ই জানুয়ারি হিলিতে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটলো যাতে মারা গেল প্রথমে ২৬ জন, পরে ৩জন, মোট ২৯জন। অথচ একেক পত্রিকায় একেক রকম প্রকাশিত হয় মৃতের সংখ্যা-তথ্য। কেউ লেখে ঐ দুর্ঘটনায় মারা গেছে দেড়শ' কেউ লেখে এক শ' কেউ লেখে পঞ্চাশ জন মারা গেছে। কেন এই সংখ্যা তথ্য-বিভ্রান্তি ঘটেছে?

সে প্রসঙ্গ এখানে নয়, কেবল বলছি সংবাদপত্রের কর্মী 'নেট ওয়ার্ক' কিভাবে বিস্তৃত হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রাথমিক খবরটি পরিবেশন করে একটি পত্রিকার প্রতিনিধি, পরদিন সকালেই বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনাস্থলে হাজির হয় একটি পত্রিকার ৫জন সাংবাদিক। স্থানীয় সংবাদকর্মীরা জয়পুরহাট রংপুর বগুড়া দিনাজপুর আক্কেলপুর থেকে আসে। এদের কেউ ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করে, প্রতক্ষ্যদর্শীর সাক্ষাৎকার নেয়, কেউ হাসপাতালে অনুসন্ধান চালায়, কেউ ছবি তোলে। যৌথ আলাপ আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য ও বিবরণ পর্যালোচনা এসবের পর প্রতিবেদন লেখা হয়।

পরবর্তীকালে সর্বস্বীকৃত হয়েছে যে ঐ পত্রিকাটি তাদের রিপোর্টে দুর্ঘটনায় নিহত হবার যে সংখ্যা প্রকাশ করে, তা-ই ছিল সঠিক। এই যে মিলিত কর্ম, সংবাদ লিখন, ছবি পাঠানো, তার সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে ফোন ফ্যাক্স যোগাযোগ মাধ্যমটি কেমন, তারচেয়েও বড় কথা তারা কতোটা লাইক-মাইণ্ডেড।

ঢাকার বাইরে থেকে কাজ করার ব্যাপারটি সাধারণভাবে খুব সহজ কাজ মনে করা হলেও আসলে তা কতোটা কেমন, তা তিনিই বুঝবেন যিনি প্রকৃতপক্ষে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন।

www.pathagar.com

শহরে কোন ঘটনা ঘটলে তা পাঠানো গেল না হয় সহজে, কিন্তু ঘটনাস্থল যদি হয় দূরের কোন এলাকা, তাহলে একই সাথে খবর আর ছবি 'কাভার' করা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। একটু উনিশ বিশ হলে মার খেতে পারে কোন স্টোরি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি। কখন ঘটনা ঘটেছে, সাংবাদিক যে শহরে থাকেন সেখান থেকে ঘটনাস্থল কতোদূর, ঐ ঘটনাস্থল থেকে ঢাকার দূরত্ব কেমন, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন, ফ্যাক্স আছে কিনা, ফ্যাক্স থাকলে তাতে ছবির কোয়ালিটি কেমন যাবে, বাহক মারফত ছবি পাঠালে তা সময়মতো ঢাকায় পৌঁছুবে কিনা এরকম হরেক বিষয় সামনে রেখে কাজ করতে হয়।

পাবনার সাঁথিয়ার কাছে ব্রীজ ভেঙ্গে বাস পড়লো খাদে, মারা গেল ১৬ জন যাত্রী। খবরটি প্রায় সব দৈনিকে প্রথম পাতায় গুরুত্বের সাথে ছাপা হয় পরদিন প্রভাতে। (মৃতের সংখ্যা : তথ্য-বিভ্রান্তিও ছিল)। কিন্তু এতোগুলো দৈনিকের মধ্যে ঢাকার কেবল একটি দৈনিকে ঐ দুর্ঘটনার দুটি ছবি (প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায়) ছাপা হয়।

দুর্ঘটনার ঐ ছবি তো আরো সব দৈনিকে ছাপা হতে পারতো, কিন্তু তা হয় নি কেন? ঘটনাস্থলের কাছাকাছি এলাকা বেড়া সাঁথিয়া এই দুই থানা শহরে বহু সাংবাদিক তো রয়েছেন, তাদের অনেকে ছবিও তুলেছেন, সেক্ষেত্রে পাবনা শহর থেকে একজন সাংবাদিক ঘটনাস্থলে গিয়ে ছবিটি তার কাগজে পাঠাতে পারলেন কিভাবে।

এখানে দ্রুততার সাথে কাজ করা ছাড়াও, ঠিক কখন ছবিটি পাঠালে কখন তা ঢাকায় পৌঁছুবে, বাহক ছবিটি পত্রিকা অফিসে পৌঁছুবেন কি-না, এসব হিসেব ছাড়াও, ছবির রীল অফিসে পৌঁছুলে তা প্রসেস করা সম্ভব হবে কি-না, ছবির কোয়ালিটি কেমন ছিল, বার্তা সম্পাদক সেটি ছাপানোর মতো পছন্দসই মনে করবেন কি-না, পজেটিভ তৈরি করার মতো সময়টুকু পাওয়া যাবে কি-না, এসব মুখ্য ব্যাপার ছিল।

একটি ব্যাপার আরেকটির সাথে জড়িত, সময়, কাজের মান, কেন্দ্রীয়ভাবে প্রসেসিং এসবের সমন্বয় না ঘটলে পাঠক পরদিন দেখতে পারতেন না লাশের সারি বা খাদে উল্টে পড়া বাসের ছবি।

. . . হ্যাঁ, একটি মাত্র দৈনিকে ঐ বাস দুর্ঘটনার ছবি ছাপা হয়, সাংবাদিকের সাথে কথা বলে জানলাম, তিনি ছবিটি তোলা মাত্র ফিল্ম রোলটি বাহক মারফত ঢাকার উদ্দেশ্যে পাঠান। যিনি বাহক, তার কর্তব্য নিষ্ঠার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন। ছবিটি পাবনা বা বগুড়া শহরে এলে প্রসেস করে ফ্যাক্সে পাঠানো যেতে পারতো, কিন্তু ঐ প্রতিনিধি সে ঝুঁকি নেন নি, কেননা ছবিটি দ্রুত প্রসেস করা যাবে কি-না, করা গেলে ফ্যাক্সে ছবির কোয়ালিটি ভাল যাবে কিনা, এ ব্যাপারে তার সন্দেহ ছিল। তাই তিনি বাহক মারফত সরাসরি ফিল্ম রোল ঢাকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।

পরবর্তীকালে, দেখা যায়, বাহক সময় মতো ফিল্ম রোলটি অফিসে দিয়েছেন, ডার্ক রুমে প্রসেসও হয়েছে, ছবি বার্তা সম্পাদকের পছন্দও হয়েছে।

অপরদিকে, দেখুন, ঘটনাস্থলের খুব কাছাকাছি এলাকায় বাস করেন এমন একজন সাংবাদিক, যিনি অপর একটি জাতীয় দৈনিকে কাজ করেন, ঐ দুর্ঘটনার ছবি তোলা সত্ত্বেও তা পরদিন তার পত্রিকায় ছাপা হয় নি। ছিল তার সিদ্ধান্তের ত্রুটি। এই

www.pathagar.com

সাংবাদিক দুর্ঘটনার ছবি তুলে পাবনা শহরে নিয়ে যান, প্রসেসও করেন, কিন্তু ফ্যাক্সে ঢাকায় পাঠাতে গিয়ে দেখেন যে টেলিফোন বিভাগের মাইক্রোওয়েভ সিস্টেমে ত্রুটি। সে কারণে ছবি ভাল যাচ্ছে না, অসংখ্য লেখা আসছে তাতে করে বোঝাই যাচ্ছে না, এটা লাশের ছবি না কিসের ছবি। শ্রম এবং অর্থ ব্যয়ের পরেও তিনি শেষ পর্যন্ত ছাপার উপযুক্ত ছবি পাঠাতে ব্যর্থ হলেন।

পাঠক হিসেবে আপনি যখন দুটি পত্রিকা পড়ছেন, দেখছেন একটি পত্রিকায় লাশের ছবি বাসের ছবি দুই ছাপা হয়েছে, অপরটিতে একটিও নেই, তখন এরকম ভাবতে পারেন যে, একটিতে ছাপলো আরেকটি মিস করলো কেন? এতো বড় দুর্ঘটনার ছবি তুলতে কি দ্বিতীয় পত্রিকার সাংবাদিক অবহেলা করেছেন? তিনি ঘটনাস্থলে যান নি? ঘটনাক্রম জানতে পারলে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আসলে ছবি তুলেছেন দুটি পত্রিকারই সাংবাদিক, পাঠিয়েছেনও তারা তা নিজ নিজ পত্রিকায়, কিন্তু সিদ্ধান্তগত হেরফের হবার কারণে কেবল প্রথম জনের তোলা ছবিই পত্রিকায় এসেছে।

ঢাকার বাইরে যারা কাজ করেন, তারা একই সাথে রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার, দুইই। সংবাদ সংগ্রহের পাশাপাশি ক্যামেরাও চালান তারা।

আগেই বলেছি, ছবির জন্যে অবশ্য আলাদা করে টাকা দেয়া হয়। কেউ ৪০ টাকা, কেউ ৫০ টাকা, কেউ আরো কিছু বেশি পান। তবে, যেসব পত্রিকা তাদের প্রতিনিধিদের লেখনীভাতা বা লাইনেজ বিল দিতে বঞ্চিত করে, তারা বঞ্চিত করে ছবির বিল থেকেও।

আজকাল, কয়েকটি পত্রিকা রঙিন ছবি ছাপছে, সেকারণে ঢাকার বাইরের সাংবাদিকরাও রঙিন ছবি তুলে পাঠাচ্ছেন। টাকা কিছু বেশি দেয়া হচ্ছে। ঢাকার পত্রিকা ছাড়া, আঞ্চলিক ও স্থানীয় দৈনিকগুলোর জন্যে আলাদা ফটোগ্রাফার নিয়োজিত আছেন। ঢাকার মতো বার্তা বিভাগ থেকে এদের কখনো এসাইনমেন্ট দেয়া হয়, কখনো নিজের পছন্দমতো ছবি তোলেন। তবে, এরা মাইনে বা পারিশ্রমিক যা পান, তা আর বলবার মতো নয়। সেই শ্রম বঞ্চনা আরেক দীর্ঘ কাহিনী। . . .

বাংলাদেশে, এমনও পত্রিকা রয়েছে যে, যেটি কোন বড় শহরে প্রতিনিধি ছাড়া কেবল ফটোগ্রাফার নিয়োগ দিয়েছেন। যেমন রাজশাহীতে দৈনিক জনতার হয়ে ফটো সাংবাদিকের কাজ করেন আজাহারউদ্দিন, চিত্রপুরী স্টুডিওর মালিক। তিনি, জনতায় ছবি ছাপা হলে একেকটির জন্যে ৫০ টাকা করে পান। হালে আজাহার উদ্দিন সংবাদও পাঠাচ্ছেন। শেরপুরে থাকেন প্রখ্যাত আলোকচিত্রী নীতিশ রায়, তার শিল্পসম্মত ছবি প্রায়শই ছাপা হয় ভোরের কাগজের ৬ এর পাতায়, এজন্যে তিনি ছবি পিছু সম্মানী পান। নীতিশ রায় ঐ পত্রিকার সংবাদ পাঠানোর দায়িত্বে নেই।

এছাড়া ঢাকার বাইরের সাংবাদিকরা পদ ও কর্মদক্ষতা ভেদে বেতন, লেখনী ভাতা, লাইনেজ বিল, এসব ছাড়াও টেলিফোন-ফ্যাক্স বিল, ডাক খরচ, কুরিয়ার সার্ভিসে প্যাকেট পাঠানোর খরচ পেয়ে থাকেন। তবে সবাই নয়। কারো কারো ক্ষেত্রে আবার পাঠানো স্টোরি ছাপা হলেই কেবল ফোন বা ফ্যাক্স বিল দেয়া হয়।

একেক পত্রিকায় একেক নিয়ম। কোন কোন পত্রিকায় ডাক যোগে খবর পাঠানোর জন্যে খাম সরবরাহ করা হয়। সাংবাদিককে টিকেট লাগাতে হয় না, প্যাকেট পোস্ট

www.pathagar.com

করলেই পরে ঢাকার অফিসে তা ডেলিভারী দেয়া হয়। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ডাক বিভাগকে একত্রে টাকা দেয়।

কোন কোন পাঠকের ধারণা আছে যে, কোন সংবাদ ছাপানোর জন্যে সাংবাদিককে দিলে বুঝিবা টাকা পয়সাও দিতে হয়। সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করেন, এই খবরের খরচাপাতি কতো দিতে হবে? আসলে কোন 'খরচাপাতি' লাগে না। খবর পাঠানোর জন্যে ফোন ফ্যাক্স খরচও খবর সরবরাহকারীকে দিতে হয় না।

তবে, কিছু সংখ্যক 'সাংবাদিক' আছেন, যারা . . . অবশ্য, এই অপকর্মটিকে 'জায়েজ' করা হয় নানা 'যুক্তি' প্রদর্শন করে।

এমনও পাল্টা প্রশ্ন শোনা যায়; 'পত্রিকা আমাকে পয়সা দেয় না, টেলিফোন ফ্যাক্সেরও পয়সা দেয় না, আমি করবো কি? গ্যাটের পয়সা খরচ করে কতদিন রিপোর্টারি করা যায়?'

আবার কেউ সমাজের অন্যান্য কিছু পেশার মানুষদের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, 'সবাইতো ইয়ে করছে, আমি করলে দোষ?' কেউ এরকম বলেন, উপরে যে ইয়েরা . . . কতো কতো ইয়ে করছে, সেগুলো নিয়ে তো কেউ কিছু বলেন না . . . আর নিচের দিকের আমরা কিছু করলেই চোখে পড়ে?'

এসব ব্যাপারে কোন মন্তব্য নেই। সমাজের অবস্থাটাই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, একে অন্যের দোষটাকে দেখিয়ে নিজের অপকর্ম জাস্টিফাই করতে চাচ্ছেন। তবে, এটা সামগ্রিক চিত্র কোনভাবেই নয়। এদেশে বহু সংবাদকর্মী আছেন যারা ঢাকায় কাজ করুন কিংবা ঢাকার বাইরে, আছেন নীতিবোধ নিয়ে, সততার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন এবং এদের সংখ্যাটাই এখনো ভারী।

ঢাকার বাইরে কাজ করেন এবং সাংবাদিক, যারা স্টাফ রিপোর্টার নন, তাদের অনেকেই ব্যক্তি প্রয়োজনে বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত। এদের মধ্যে কেউ ব্যবসায় করেন, কেউ আইনজীবী, কেউ ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, কেউ স্কুল কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। স্থানীয় দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রিকায় কাজ করেন কেউ, কেউ কেউ ঐ পত্রিকার রিপোর্টার, এসাইনমেন্ট এডিটর, সাব-এডিটর এমনকি বার্তা সম্পাদক। এমনও আছেন, যারা স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। কেউ মালিক-সম্পাদক। কেউ আবার বিটিভির জেলা বার্তা প্রতিনিধি, রেডিওর জেলা সংবাদদাতা। কেউ সামান্য কিছু সম্মানীর বিনিময়ে বিদেশী প্রচার মাধ্যমে খবরাখবর সরবরাহ করেন।

ধরুন, আপনার এলাকায় ঘটেছে বড় এক দুর্ঘটনা, মারা গেছে ২৫ জন, আহত অনেক। বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে, ঢাকার কাগজে ছাপা হয়ে আসছে পরদিন, কিন্তু বিবিসির সান্ধ্যকালীন সংবাদে আপনি শুনলেন সে খবরটি প্রচারিত হলো। আপনি তো বিস্মিত। ভাবলেন বিবিসি এতো দ্রুত কি করে পেলো এই দুর্ঘটনার খবর। তাদের প্রতিনিধি ঢাকায় কেবল নয় এই ছোট্ট জেলা শহরেও আছে।

আসলে, না, নিয়মমাফিক লিখিতভাবে নিয়োগকৃত কোন প্রতিনিধি নেই, হয়তোবা সাংবাদিকদের মধ্যেই কেউ আছেন যিনি সময়ে সময়ে কেবল বড় কোন ঘটনা-দুর্ঘটনা

www.pathagar.com

ঘটলে এবং তা বিবিসিতে প্রচার হতে পারে এমন যোগ্য বিবেচনা করলে টেলিফোনে স্টাৎ করে জানিয়ে দেন ঢাকায়, বিবিসির বাংলাদেশ সংবাদদাতার কাছে। ঢাকা থেকে সেটি প্রচারযোগ্য মনে হলে বিবিসি লণ্ডন-এ পাঠানো হয়। আপনি খুব দ্রুত খবরটি শুনতে পারেন। বিবিসি কেবল নয়, আর সব বিদেশী প্রচার মাধ্যম ও কোন কোন বিদেশী সংবাদ সংস্থায় একই পদ্ধতিতে খবর যায়।

এই যে যিনি খবরটি দিলেন, খুব ঘনিষ্ঠজন ছাড়া তার পরিচিতি খুব একটা কেউ জানতে পারেন না। এই সংবাদদাতাদের নিজস্ব টেলিফোন থাকে, সেই টেলিফোনেই খবরটি ঢাকায় পাঠিয়ে দেন, কখনো আবার ঢাকা থেকে টেলিফোন করে গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা ঘটলে তা জেনে নেন, জেনে নেন প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন।

অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি লণ্ডনের বুশ হাউস থেকে টেলিফোন করেও জেলা শহরে অবস্থানরত এই সংবাদদাতার সাথে কথা বলে কোন খবর সংশ্লিষ্ট ইনফরমেশন বা কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষ্য নেয়া হয়। এখানে বলে রাখি, বিবিসি বা অন্যান্য বিদেশী প্রচার মাধ্যম ঢাকা মহানগরীতে ঘটে যাওয়া খবর নিজেদের কর্মীছাড়াও কখনো কখনো কোন সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা বা সাংবাদিকের কাছ থেকে জেনে নেন। এটা তাদের সংবাদ সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কিত নেট ওয়ার্কের ব্যাপার।

বছর কয়েক থেকে দেখা যাচ্ছে, বেশ কয়েকটি জাতীয় সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ থানা এবং শহর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নবগঠিত পৌরসভা এলাকার জন্যে 'নিজস্ব সংবাদদাতা' নিয়োগ করেছেন। বিভাগীয় বা জেলা শহর থেকে প্রকাশিত দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে, এরকম সাংবাদিকের সংখ্যা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। কতো বেশি এবং তা কে কিভাবে কাজ করেন, এটা জানানোর জন্যে সবগুলো এলাকার কথা বলা যাবে না, কেননা তাতে কয়েক হাজার নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

জাতীয় দৈনিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় দৈনিক, ঢাকা থেকে প্রকাশিত নতুন নতুন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ এবং সেগুলোর জন্যে সংবাদদাতা নিয়োগ করার একেকটি জেলা শহর ও থানা সদরে সাংবাদিকের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গেছে। যেসব জেলা শহরে পাঁচ ছয়টি করে দৈনিক আর সাপ্তাহিক নিয়মিত বা অনিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, সেখানে সাংবাদিক সহ মোট সংবাদপত্র কর্মীর সংখ্যা বহু।

পাঠক, আবার ঢাকার এদিকে ফিরে আসি। ঢাকার স্টাফ রিপোর্টার এবং ঢাকার বাইরে কর্মরত স্টাফ রিপোর্টার, প্রতিনিধি, নিজস্ব সংবাদদাতা, এঁদের সম্পর্কে বলতে বলতে আমরা চলে গিয়েছিলাম উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত, এখন ফিরে এসে দেখা যাক, ঢাকায় আর সব সাংবাদিকরা কে কিভাবে কাজ করছেন।

ফটোগ্রাফারদের কথা এখনো বলা হয় নি। এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ, যা না হলে সংবাদপত্র প্রকাশনা কল্পনাই করা যায় না। পাঠক হিসেবে আপনি কেবল খবর কিংবা সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, ফিচার এটা ওটা পড়েই সন্তুষ্ট নন, সাথে ছবিও চান। একটি ছবি তো হাজার শব্দের সমান কথা বলে।

ফটোগ্রাফার, এদের কেউ বলেন আলোকচিত্রী, আলোকচিত্রশিল্পী, কেউ বলেন ফটো সাংবাদিক। এরা ওয়েজবোর্ড অনুযায়ী বিভিন্ন 'গ্রেড'-এর। সেভাবেই বেতন ভাতা

www.pathagar.com

পান। অধিকাংশ পত্রিকায় একাধিক ফটো সাংবাদিক আছেন। এদের মধ্যে কেউ চীফ ফটোগ্রাফার, কেউ সিনিয়র, কেউ জুনিয়র। জনকণ্ঠ পত্রিকায়, হালে ফটো এডিটর নিয়োগ করা হয়েছে।

ঢাকা থেকে যেসব দৈনিক পত্রিকা বের হয় সেগুলোর মোট ফটোগ্রাফারের সংখ্যা ছোট বড় মিলে প্রায় অর্ধশতাধিক। এদের মধ্যে নামে ছবি ছাপা হয় বেশ ক'জনের। তাছাড়াও, অন্যান্য সাপ্তাহিক, সিনে সাপ্তাহিক, রম্য পত্রিকা, ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকা, এগুলোর কোন কোনটায় পৃথক ফটোগ্রাফার আছেন যাদের সংখ্যা প্রায় ২৫-৩০ জন।

এমনও ফটোগ্রাফার আছেন, কাজ করেন কোন দৈনিক পত্রিকায়, তিনি তার ছবি একই প্রকাশনা গ্রুপ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় কিংবা অন্যান্য দৈনিক বা সাপ্তাহিকীতে সরবরাহ করে থাকেন।

কেউ কেউ বিদেশী সংবাদ বা ফটো এজেন্সীর (যেমন : রয়টার, এপি, এএফপি) হয়ে কাজ করেন, এজন্যে আলাদা সম্মানী পান।

কথাটা খুব হালকা, তবু বেশ প্রচলিত। কিছু লোক আছেন, যারা সাংবাদিক বলতে ঐ ফটোগ্রাফার কিংবা গলায় ক্যামেরা ঝোলানো একজনকেই বুঝে থাকেন। আগে, একবার, হরতাল চলার সময়ে একটি দৈনিকের বার্তা সম্পাদক, সাব এডিটর, রিপোর্টার এরা দুপুরে বাড়ি ফিরছিলেন বেবীট্যাক্সিতে করে, পথে তাদের আটকানো হলো। গাড়ির সামনে বড় করে লেখা ছিল 'সাংবাদিক', তারপরেও পরিচয়পত্র দেখানো হয় পিকেটারদের। কিন্তু তারা কোনভাবেই কথা শুনতে নারাজ। বলে : 'সাংবাদিক হলে আপনাদের ক্যামেরা কই?'

এটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা, এমন ঘটনা বহু জায়গায় বহুবার ঘটেছে। এ রকম হবার কারণও আছে বটে। কোন ঘটনা-দুর্ঘটনা, হরতাল, অবরোধ সভাসমাবেশ, মিছিল, সংঘর্ষ এসব হলে পরে সেখানে একজন স্টাফ রিপোর্টার থাকেন, কিন্তু তিনি হয়তোবা জনতার ভিড়ে মিশে থাকেন, কিন্তু ফটোগ্রাফারদের সে অবকাশ নেই, ক্যামেরা বাগিয়ে তাদের তৎপর-সতর্ক থাকতে হয় প্রতিটি মুহূর্ত, এদিকে-ওদিকে দৌড়াচ্ছেন, একের পর এক ছবি তুলছেন, এটাই সাধারণত দেখেন পিকেটাররা এবং এরকম ভাবেন এটাই 'সাংবাদিক'।

তবে না, কেবল পিকেটার বা টোকাই পিচ্চি নয়, সমাজে এমন আরো কেউ কেউ আছেন যারা ক্যামেরা কাঁধে তৎপর একজনকেই 'সাংবাদিক' বুঝে থাকেন বা অপরকেও বোঝান। হালের কোন কোন টিভি নাটকে দেখবেন যে, সাংবাদিক চরিত্রে অভিনয়কারী নায়কের কাছে ক্যামেরা চাপিয়ে দেয়া হয়। যেমন : সাম্প্রতিক সময়ে প্রচারিত বিটিভির একটি প্যাকেজ নাটকে সাগির আলী (সাংবাদিক) চরিত্রে এমনটি দেখানো হয়েছে।

বিভিন্ন স্থলে দেখা যায় তিনি কেবল সংবাদ সংগ্রহ করছেন না, ছবিও তুলছেন। এ কারণে দর্শকদের বিভ্রান্তিও রয়েছে সাংবাদিক সম্পর্কে। আসলে, প্রকৃত ব্যাপারটি হলো, নিতান্তই পরিচিতির প্রয়োজনে ঢাকায় কর্মরত একজন সাংবাদিক (স্টাফ রিপোর্টার) ক্যামেরা বহন করেন, হয়তোবা ছবিও তোলেন, কিন্তু তা লোকে দেখে এমন অবস্থায় নয়।

www.pathagar.com

সাধারণত চিত্রটি হলো : প্রতিটি দৈনিকে রিপোর্টার আলাদা, ফটোগ্রাফার আলাদা। রিপোর্টার সংবাদ সংগ্রহ করেন, ফটোগ্রাফার ফটো তোলেন। পরে সংবাদ লেখা ও ছবি প্রসেস হবার পর পত্রিকায় তা ছাপা হয়। ধরুন, প্রেসক্লাবে হচ্ছে কোন দলের সাংবাদিক সম্মেলন, সেখানে একজন রিপোর্টারকে যেমন এসাইনমেন্ট দেয়া হলো, তেমনি দেয়া হলো একজন ফটোগ্রাফারকে। দু'জনে একই স্থানে সময়মতো উপস্থিত থেকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করলেন। তবে, এমনও কখনো ঘটে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে একজন ফটোগ্রাফার কোন ঘটনা বা বিষয়ের ছবি তোলা মিস করলে তা আরেকজনের কাছ থেকে চেয়ে নেন। এটা পারস্পরিক সম্পর্ক ও সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপার।

কিন্তু যেগুলো ছবি পত্রিকার জন্যে এক্সক্লুসিভ, সেগুলো সাধারণত একজন আরেকজনকে দেয় না। এমন হলো যে, ফটোগ্রাফার আসাদ কোন কারণে যেতে পারেন নি আওয়ামী লীগের সাংবাদিক সম্মেলনে, হয়তো তিনি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছুতে দেরি করেছেন, হয়তো তিনি আরেকটি এসাইনমেন্ট নিয়ে অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন, অথচ ঐ সাংবাদিক সম্মেলনের ছবিটি তার না হলেই নয়। সেক্ষেত্রে আসাদ ঐ ছবিটি চেয়ে নিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ফটোগ্রাফার আমিনের কাছ থেকে। এটা হয়ে থাকে। কিন্তু আসাদ যদি তার পত্রিকার জন্যে এমন একটা ছবি তোলেন যে, পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালাচ্ছে আর সামনে মিছিলের একজন বুক চেপে ধরে ঢলে পড়ছেন, এমন একখানা এক্সক্লুসিভ ছবি, দেশ বিদেশে ব্যাপক সাড়া জাগাবে, নিজের নামে ছাপা হলে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার কর্ম-তৎপরতায় খুব খুশী হয়ে যাবেন, এমন ছবি হলে আসাদ তা আমিনকে দেবেন না।

পত্রিকার সম্পাদক বা বার্তা সম্পাদক যদি কোন ফটোগ্রাফারকে বিশেষ বিষয়ের ওপর কোন ছবি তুলে আনতে বলেন, যা নিয়ে বিশেষ সংবাদ বা সংবাদ ফিচার লেখা হবে, সে ছবিও আসাদ আমিনকে দেবেন না।

সাধারণভাবে কেউ কেউ আলোচিত সাংবাদিকের কাজটিকে, 'ও আর এমন কি কাজ' এভাবে দেখেন। ক্যামেরা বাগিয়ে সার্টার টিপলেই তো ছবি উঠে যায়। কিন্তু বাসাবাড়ী কিংবা পার্কে পিকনিকে সৌখিন ছবি তোলা আর সংবাদপত্রের ছবি তোলা এক নয়। এ এক ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, দারুণ টেনশনের কাজ। এটা ঠিক যে কোন কোন পত্রিকায় কারো কারো কাজ বেশ কম। স্টাফ ফটোগ্রাফারের ছবি ছাপা হয় দুয়েকটা, বাকিগুলো যায় বিদেশী ফটো এজেন্সীর ছবি, বিদেশী পত্রিকা থেকে কেটে নেয়া ছবি, পিআইডি থেকে পাঠানো ছবি। এঁরা কিছুটা স্বস্তিতে থাকতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ ফটোগ্রাফারের কর্মতৎপরতা, বিশেষ করে যেসব পত্রিকায় ফটোগ্রাফারের সংখ্যা কম, তাদের ওপর খাটুনির ধকল যায় বেশি। এখানে ওখানে ছুটতে ছুটতে প্রাণান্তকর অবস্থা।

যখন রাজনৈতিক আন্দোলন চলে, একাধিক দলের জনসভা হয়, মিছিল হয়, সাংবাদিক সম্মেলন হয়, হরতাল অবরোধ ধর্মঘট চলে, তখন খাটুনি-চাপ বেড়ে যায়। কোন পত্রিকায় যদি তিনজন ফটোগ্রাফার থাকেন, তাহলেও পরিস্থিতি সামাল দেয়া হয়

www.pathagar.com

মুস্কিল। তিনজনের একজন হয়তো ছুটিতে, কিংবা তার অফ-ডে, কিংবা তিনি আরেক কোন কাজে ঢাকার বাইরে গেছেন, এ সময় দু'জন ফটোগ্রাফারকে সকালে মিছিল, হরতাল চলাকালীন সময়ে ঢাকা শহরের অবস্থা, পুলিশ জনতা সংঘর্ষে, দুপুরে-বিকেলে একাধিক স্থানে একাধিক দলের জনসভা, জনসভার পর মিছিল, সাংবাদিক সম্মেলন, নানান ছবি তুলতে হয়।

রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া আরো বিষয়ের ওপর ছবি তোলার ব্যাপারটিও আছে। কোন ছবি মিস হলে, কিন্তু ছবি তুললেও তা বার্তা সম্পাদকের পছন্দসই না হলে নানা কথা শুনতে হয়, পত্রিকা কর্তৃপক্ষও অসন্তুষ্ট হন, পাঠক ছবি না দেখলে অতৃপ্ত থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর যেমন, তেমনি একটি ভালো ছবি মিস করা মানে পত্রিকার প্রচার সংখ্যার ওপর তার প্রভাব পড়ে। সব দৈনিকে এমন ছবি ছাপা হয়ে গেল পুলিশ গুলি চালাচ্ছে মিছিলের ওপর, পাশে আছে গুলিতে নিহত তিনজনের লাশের ছবি, কিন্তু আপনি যে পত্রিকাটি পড়েন তাতে ঐ ছবি নেই তাহলে দিনের পর দিন এমন হলে, ঐ পত্রিকা বদলে ফেলবেন আপনি। সেক্ষেত্রে, পাঠক চাহিদা তথা ব্যবস্থার দিকটি সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ ছবি ছাপতে হয় পত্রিকায়। সেখানে ফটোগ্রাফারের ব্যর্থতা কোন কোন ক্ষেত্র ছাড়া কোনভাবেই সহজে নেয়া হয় না। এ কারণে প্রচণ্ড মানসিক চাপে থাকতে হয় তাকে। ঝুঁকিটাতো মারাত্মক। যাদের টেলিলেন্স আছে তারা সুবিধাজনক স্থানে দাঁড়িয়ে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষের ছবি হয়তোবা তুলতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারে গুলির মুখে গিয়ে ছবি তুলতে হয়। একদিকে জনতার ইটপাটকেল নিক্ষেপ, কখনো বা (সন্ত্রাসী হলে) অস্ত্রের ব্যবহার অন্যদিকে পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস, কখনো গুলি, এর মাঝেও একের পর এক ছবি তুলে যেতে হয় ফটোগ্রাফারকে।

প্রায়শই আপনারা কাগজে পড়েন সংঘর্ষের সময় এতো এতো ফটো সাংবাদিক আহত হয়েছেন। আহত কিংবা লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা জনতা-পুলিশ দু'পক্ষ থেকেই ঘটে। জনতা যদি হয় সন্ত্রাসী, তাদের হাতে আছে অস্ত্রশস্ত্র, সেসময় মারমুখী জনতার ছবি তুলতে গেলে তাদের একটা অংশ হামলা করে ফটো সাংবাদিকের ওপর, কেননা, তারা চায় না তাদের চেহারা সেলুলয়েডের ফিতায় বন্দী হয়ে যাক। হলে পরে, পরবর্তীকালে, পুলিশী তৎপরতার সময় (যদি হয়) সহজে চিহ্নিত হয়ে যাবেন তারা। চিহ্নিত হবেন আর সব পরিচিতজনের কাছে।

অপরদিকে পুলিশ হামলা করে ফটো সাংবাদিকের ওপর, চিহ্নিত হয়ে যাবার কারণেই। জনতা যখন পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছুঁড়ছে আর পুলিশের দল দৌড়ে পালাচ্ছে, সে ছবি তোলা যায়, পুলিশ কোথাও প্রহরায় রয়েছে, সে ছবি তোলা যায়, পুলিশ আহত হয়ে পড়ে আছে বা হাসপাতালের বিছানায় শায়িত সে ছবি তুলতে বাধা নেই, কিন্তু পুলিশ যখন গুলি ছুঁড়ছে বা জনতাকে লাঠিপেটা করছে, একজন ফটো সাংবাদিক একেবারে পুলিশের সামনাসামনি সে দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দী করতে গেলে বাধা পান, মারপিট করা হয়, ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়া বা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়। হয়রানি তো আছেই। এ ধরনের বহু ঘটনা প্রতিটি সরকার আমলেই ঘটেছে, ঘটছে।

পুলিশ গুলি ছুঁড়ছে এরকম ছবি পত্রিকায় ছাপা হলে রাজনৈতিকভাবে তা খুব রিএ্যাক্ট করে। সংঘর্ষ ও হতাহত ঘটনার পর সরকার হয়তোবা এরকম প্রেসনোট দেয়

www.pathagar.com

যে পুলিশের গুলিতে নয় সশস্ত্র লোকজনদের কারো গুলির আঘাতেই এক ব্যক্তি মারা গেছে, প্রেসনোটের বিবরণ ছাপাও হয়ে যায়, কিন্তু প্রেসনোটের পাশে যদি এরকম দেখা যায় যে পুলিশ রাইফেল উঁচিয়ে আছে ধেয়ে আসা মিছিলটির দিকে, তাহলে ঐ সরকারী প্রেসনোটের বিশ্বাসযোগ্যতা একেবারেই থাকে না, পাঠক ধরেই নেয় যে পুলিশ জনতার উপর গুলি ছুঁড়েছিল এবং ঐ ব্যক্তিটি তাতেই মারা গেছে, এখন পরিস্থিতি অন্যখাতে বইয়ে দেবার জন্যে বলা হচ্ছে সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিতেই ঐ লোকটি মারা গেছে।

তাছাড়া, কর্তব্যরত পুলিশ বা পুলিশদল, যারা গুলি ছুঁড়েছেন, তারাও তাদের কর্তৃপক্ষ বা পরিচিত লোকজনদের কাছে চিহ্নিত হতে চান না।। এজন্যে বাধা দেন তারা ছবি তোলায়।

কেবল রাজনৈতিক সংঘর্ষ বা পুলিশী হামলার সময় যে বাধা পান ফটো সাংবাদিক, তা নয়, অন্যান্য ঘটনা বা বিষয়ের ক্ষেত্রেও পান। ছবি তুলতে দেয়া হয় না, ফটো সাংবাদিককে ঘটনাস্থলের কাছে ভিড়তেই দেয়া হয় না। কিছু কিছু স্থান আছে (যেমন সেনানিবাস) যেগুলো খুব স্পর্শকাতর স্থান, ফটোগ্রাফার নিজেই জানেন কোথাকার ছবি তুললে তা রাষ্ট্রীয় ক্ষতির কারণ হবে। কিন্তু সাধারণভাবে বাধা নেই বা বাধা দেয়ার মতো ব্যাপার আদৌ নয় এমন স্থান বা ব্যক্তির ছবি তোলার ব্যাপারে খামাখা বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করেও ঘটনা বা বিষয়ের ওপর ছবি তুলে আনতে হয় একজন ফটোগ্রাফারকে।

ছবির বিষয় কোন খুনের অভিযুক্ত আসামী, দুষ্কৃতকারী, ছিনতাইকারী, ধর্ষণকারী, এরা হলে দেখবেন ছবি তোলার সময় হাত দিয়ে বা কাগজ দিয়ে মুখ ঢেকেছেন তারা। ফটো সাংবাদিক সে অবস্থাতেই ছবি তোলেন এবং ছাপা হয়।

কোন কোন বিষয়ের ওপর ছবি তোলার ব্যাপারে সরকার বা সরকারী দল থেকেই কেবল নয়, বিরোধীদল থেকেও বাধা দেয়া হয়। যেমন : ছবি তোলার ব্যাপারে বাধা দেয়ার ব্যাপারটি ঢাকার বাইরে খুব ঘটছে আজকাল। অন্যায়কারী যারা তারা ঘেরাও করেন ফটোগ্রাফারকে, লাঞ্ছিত করেন, ছিনিয়ে নেন ক্যামেরা বা ফিল্ম খুলে নেন। '৯৫-এর জানুয়ারিতে একজন সাংবাদিক উত্তরের জেলা সিরাজগঞ্জে ছবি তুলতে বাধা পেয়েছেন এভাবে :

১. যমুনার তীরে, যেখানে যমুনা সেতু নির্মিত হবে, সেখানে কিছু টাউট-বদমাশ ব্যক্তি ঘরবাড়ী তুলেছেন, সেতুর জন্যে জায়গাজমি হুকুমদখল করে যে ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়া হবে, সেই লোভে চরের জমিতে ঘরবাড়ী নির্মাণ। যারা ঘরবাড়ি তুলছিল তারা সাংবাদিককে (তিনি ছবিও তোলেন) বাধা দেয়, ঘেরাও করে ক্যামেরা ছিনিয়ে নেবার পায়তারা করে। চরের জমিতে ঘরবাড়ি তোলা হচ্ছে, এমন ছবি পত্রিকায় ছাপা হলে এদের জারিজুরি প্রকাশিত হয়ে যাবে, এজন্যেই তারা মূলত ছবি তুলতে বাধা দেয়। কিন্তু কারো বাধা বিপত্তির মুখে একজন সাংবাদিককে বসে থাকলে চলে না। তিনি ঠিকই ছবি তোলেন এবং এলাকা ত্যাগ করেন।

এখানে তিনি কৌশলের আশ্রয় নেন। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সাংবাদিক বলেন, তিনি সরকারি পত্রিকার সাংবাদিক এবং এখানে যে ঘরবাড়িগুলো আগে থেকেই ছিল এবং

www.pathagar.com

এইসব ঘরবাড়ির মালিকদের ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া উচিত এই ছবি তুলে নিয়ে তা সরকারকে দেখানো হবে। লোকজন এটা বিশ্বাস করে এবং নির্মিত ঘরবাড়ির ছবি তুলতে দেয়। সে ছবি একটি দৈনিকে প্রতিবেদনের সাথে প্রথম পাতায় ছাপাও হয়ে যায়। প্রতিক্রিয়া হয় খুবই। যমুনার চরে হুকুমদখলকৃত জমির ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যাপারে নীতি পরিবর্তন করা হয়।

২. ঐ ছবি তোলার পর সিরাজগঞ্জ শহরে ফেরার পথে সাংবাদিক দেখতে পান যে পথের ধারে একটি বিড়ি কারখানায় একদল শ্রমিক অত্যন্ত আপত্তিকর পরিবেশে কাজ করছে, শ্রমিকদের আবার অধিকাংশেই ৬-৭ বছর বয়সের শিশু। তামাকের গুঁড়ো এদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ ঘটেছে। টেলিলেন্স থাকলে ছবিটি দূর থেকে তোলা যেতো, কিন্তু সে সুযোগ ছিল না, সেকারণে সাংবাদিক ঘটনাস্থলে নেমেই মুহূর্তের মধ্যে একটি সার্টার টেপেন। ছবি ওঠে।

কিন্তু পরমুহূর্তে সাংবাদিকের উপস্থিতি জানতে পেরেই কারখানার মালিকপক্ষ, তাদের নিয়োজিত দালাল-শ্রমিক এবং সাধারণ শ্রমিকরা জড়ো হয়ে যায়। তারা সাংবাদিকটিকে ঘেরাও করে ফেলে এবং কোথা থেকে এসেছে, কোন্ পত্রিকার রিপোর্টার, কি কারণে বিড়ি কারখানার ছবি তুলতে এসেছে জানতে চায়। সাংবাদিক প্রথমেই যে একটি ছবি তুলে ফেলেছিলো এটা কেউ কেউ দেখে ফেলেছিলেন এবং তারা একরকম বলে বসে যে ঐ ছবিটি ক্যামেরা থেকে খুলে না দিলে সাংবাদিককে স্থান ত্যাগ করতে দেয়া হবে না।

বলা বাহুল্য, ঐ জায়গাটি ছিল যমুনার চর এলাকা, মানুষজন খুব দুর্দান্ত ধরনের, সাংবাদিককে তারা দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত করতে পারে, ক্যামেরাও ছিনিয়ে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে সাংবাদিকটি কৌশলের আশ্রয় নেন। জায়গাটিতে একটি রাজনৈতিক দলের প্রভাব রয়েছে, তবে দলের স্থানীয় নেতা বাস করেন সিরাজগঞ্জ শহরে, সাংবাদিক সেটা আগে থেকে জানতেন এবং ঐ নেতা তাকে বিড়ি শ্রমিকদের সমস্যার সংবাদ লিখার জন্যে কারখানার ছবি তুলতে পাঠিয়েছেন এই নিরেট মিথ্যা কথাটি বলেন। কথাগুলো এমনভাবে বলা হয় যে শ্রমিকেরা তা বিশ্বাস করে এবং সাংবাদিককে শুধু ছেড়েই দেয় না আরো কিছু ছবি তুলতে দেয়, খাতির যত্নও করে। তবে, পরের তোলা ছবিগুলোতে কোন শিশু শ্রমিককে থাকতে দেয়া হয় নি, তাদের সরিয়ে সেখানে যুবক শ্রমিকদের বসানো হয়। কিন্তু আসল যে ছবিটি, যাতে শিশু শ্রমিক রয়েছে, তা তো সাংবাদিক প্রথমেই তুলে ফেলেছেন।

ছবি তুলতে গিয়ে, ঢাকায় হোক আর ঢাকার বাইরে হোক, অনেক ক্ষেত্রেই বাধা বিপত্তি এবং ঝক্কি-ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয় একজন চিত্র সাংবাদিককে। প্রায় সবার কর্মজীবনে এরকম ঘটনা ঘটেছে। এখানে ইত্তেফাকের ফটো সাংবাদিক রশিদ তালুকদারের গল্পটি শুনুন :

একজন ফটো সাংবাদিককে যেমন হতে হয় ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন, তেমনি সময়টি তার জন্যে হয়ে দাঁড়ায় বড় বিষয়। সময়ের উনিশ-বিশ হলে পরে প্রয়োজনীয় ছবি মিস হয়ে যেতে পারে। একজন সাংবাদিক, ধরুন তার এসাইনমেন্ট আছে নেতানেত্রীর

www.pathagar.com

জনসভার। তিনি সেখানে একটুখানি দেরি করে উপস্থিত হলেও খবরটি সংগ্রহ করতে পারেন, প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ জেনে নিতে পারেন, নেতানেত্রীর বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ অন্য কোন সাংবাদিকের নোট থেকে টুকে নিতে পারেন, এমনও হয় যে, অফিসে ফিরে সংবাদসংস্থার প্রেরিত খবরটিও 'স্লাগ' থেকে দেখে নিতে পারেন। কিন্তু একজন ফটোগ্রাফার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে দেরি করলে এক্সক্লুসিভ ছবি হারাতে পারেন। নেতানেত্রীর বক্তৃতারত ছবি হয়তো বা অন্য কারো কাছ থেকে চেয়ে নেয়া যায়, কেননা সেটা এক্সক্লুসিভ কিছু নয়, সব পত্রিকাতেই প্রায় একই ভঙ্গির ছবি ছাপা হবে।

কিন্তু জনসভার আগে পরে কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলে, বোমাবাজী হলে, লোকজন ছুটে পালাতে থাকলে, নেতানেত্রী বিশেষ কোন ভঙ্গিমায় বসে থাকলে, সে ছবি চেয়ে পাওয়া মুস্কিল। যদি কেউ তা তুলে থাকেন, দেবেন না তা একই কারণে যে, তিনি ঐ দৃশ্যের একটি মাত্র ছবিই তুলেছেন এবং পরদিন দুই পত্রিকায় একই এ্যাংগেলের ছবি ছাপা হলে পরে ফটোগ্রাফার প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। এসব কারণে একজন ফটো সাংবাদিককে দ্রুততার সাথে সময় মতো ঘটনাস্থলে হাজির থাকতে হয়, কোন দৃশ্য যাতে এড়িয়ে না যায় সেজন্যে দৃষ্টি রাখতে হয় সজাগ। ছবি ছাপা হবে কি হবে না, সেটা পরের কথা, বার্তা সম্পাদনকারীদের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার, অনেকক্ষেত্রে পত্রিকার পলিসির ব্যাপার, স্পেস পাওয়া যাবে কি না, সে ব্যাপার। কিন্তু ছবি ফটোগ্রাফারকে তুলতেই হয়। একটি নয় অনেকগুলো। একটি সভাসমাবেশ অনুষ্ঠান বা কোন বিষয়ের ওপর, দেখবেন যে একজন ফটোগ্রাফার অনেক সময় একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছেন, বহু ছবি তুলছেন। পরদিন পত্রিকায় ছাপা হয় একটি ছবি, তবু কেন এতো ছবি তোলার প্রয়োজন হয়?

এর নানা কারণের মধ্যে একটি হলো : ঘটনা বা বিষয়ের ওপর ভাল 'এ্যাংগেল' চান তিনি। একটি ছবি কোন কারণে (আলো-গতি-বিষয়ের ভঙ্গিমায়) নষ্ট হয়ে গেলে আরেকটি যাতে ব্যবস্থা করা যায়। ছবি তুলে আসার পর ফটোগ্রাফার একই বিষয়ের ওপর একাধিক ছবি প্রিন্ট করেন। বার্তা সম্পাদক তা থেকে ছাপানোর জন্যে নির্বাচন করেন একটি।

এমন হলো যে, ঢাকায় হরতাল হচ্ছে, ফটোগ্রাফার যানবাহন শূন্য সড়কের ছবি তুলেছেন ফার্মগেট থেকে, নিউমার্কেট এলাকা থেকে আবার মতিঝিল এলাকা থেকে। হয়তোবা তিন এলাকার তিনটি ছবি ছাপা হবে না, তবু ফটোগ্রাফার তা তোলেন এবং প্রিন্ট করে দেন। যে ছবিটি পছন্দ হয়, সেটিই পরদিন ছাপা হয় পত্রিকায়। বক্তৃতারত অবস্থায় নেতানেত্রীর ছবি বেশি তুলতে হয় এ কারণে যে, ফটোগ্রাফার হয়তো এমন একটা ভঙ্গি ক্যামেরায় ধরতে চাচ্ছেন যাতে দেখা যাবে নেতানেত্রী কিছু একটা নির্দেশের ভঙ্গিতে উপরের দিকে হাত উঁচিয়েছেন। কিংবা তিনি কিছু বলবার সময় মুখ হা করেছেন, মাইক্রোফোন থেকে সোজাসুজি মুখ সরিয়ে ডানে বা বায়ে জনতার দিকে মুখ করে কথা বলছেন। এ ধরনের ভঙ্গি ধরে রাখার জন্য একের পর এক সার্টার টেপেন তিনি। একটায় না একটায় ভাল ভঙ্গি হয়তোবা মিলেও যেতে পারে।

www.pathagar.com

যারা আজকাল মোটর ড্রাইভ ক্যামেরা ব্যবহার করেন, তাদের জন্যে সুবিধা। মোটর ড্রাইভে ছবি তুললে এক সার্টারে ৮টি ছবি ক্যামেরা বন্দী হয়ে যায়। কয়েক সেকেন্ড পর পর। নেতানেত্রীর বক্তৃতা, মারপিট বা সন্ত্রাসী ঘটনা, গুলি ছোঁড়া, কেউ দৌড়াচ্ছে, খেলার ছবি পর্যন্ত যেসব ছবিতে সাবজেক্টের 'এ্যাকশন' থাকে, সেগুলো ভাল আসে। হয়তো পুলিশ কারো প্রতি টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করছে, বা রাইফেল তুলে বাট দিয়ে কাউকে পেটাচ্ছে, কাউকে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, এ ধরনের বিষয়ের ছবি মোটর ড্রাইভে (৮টি) তুলতে পারলে ভালো একটা ভঙ্গি পাওয়া যায়।

সিনিয়র সাংবাদিক, অধিক প্রচার সংখ্যা এমন পত্রিকায় কাজ করেন, বিদেশী সংস্থার ছবি সরবরাহ করেন এমন ফটো সাংবাদিকরা আজকাল মোটর ড্রাইভ সিস্টেমের ক্যামেরা ব্যবহার করছেন।

অনেকের একাধিক ক্যামেরায় কাঁধে হাতে ঝুলছে দেখবেন। একটাতে আছে সাদা কালো ফিল্‌ম। একটাতে আছে রঙিন ছবির ফিল্ম, কোনটায় জুম লেন্স লাগানো, কোনটায় ওয়াইড লেন্স, কোনটায় আবার নরমাল লেন্স, আগে ছবিতে আপনারা দেখতেন বিদেশী কোন ফটোগ্রাফার এলে, তার কাঁধে বুকে একবোঝা ক্যামেরা। কোনটার লম্বা লেন্স, কোনটার খাটো। এখন আমাদের দেশের কোন কোন ফটোগ্রাফার একাধিক ক্যামেরা ব্যবহার করেন।

ঢাকায়, এমনকি বড় শহরে দেখবেন ফটোগ্রাফারদের কাঁধে একটা করে সাইড ব্যাগ থাকে। এটা বেশ কালো। এতে থাকে এক্সট্রা ক্যামেরা, লেন্স, ফিল্ম, টুকিটাকি নানানটা। ঢাকায় এমন দৃশ্য প্রায়শই চোখে পড়ে যে, মোটর সাইকেলে একজন ফটো সাংবাদিক ছুটে চলেছেন, তার সামনে খাপ খোলা ক্যামেরা ঝোলানো, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। এই ব্যাগ নিয়ে পড়তে হয় বিব্রতকর অবস্থায় যদি গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটি ঐ ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখা হয়। যান কেউ বাস স্ট্যান্ডে, যাত্রী ভেবে হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দেবে বাসে তোলার জন্য। হোটেলের সামনে দিয়ে গেলে ডাকবে আপনাকে এই যে আসুন ভাল থাকার জায়গা আছে এখানে। এসব ঘটে ঢাকার বাইরের জেলা শহরগুলোতে। কিন্তু, রাজধানীতে, অনেক অনুষ্ঠানে দেখেছি, গলায় ক্যামেরা আর কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো দেখলেই ফটক থেকে সরে দাঁড়ায় পাহারাদার।

'এই এসে গেছে সাংবাদিক'। তবে এমন কিছু এলাকা বা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ছবি তোলার জন্যে ফটোগ্রাফার ব্যাগ বহন করেন না, খাপখোলা ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে প্রবেশও করেন না। তার দেহে লুকানো থাকে ছোট ক্যামেরা। গোপনে ঢুকে সট করে ছবিটি তুলে নিয়েই বেরিয়ে পড়েন। এটা নির্ভর করে ঘটনাস্থল কোন্‌টা, ছবির বিষয়টি কি রকমের। ছবি তোলার কৌশল নির্ধারিত হয় সেভাবেই।

এমন এলাকা আছে, যেখানে খামাখা বাধার সৃষ্টি করা হয় ছবি তুলতে। প্রধানমন্ত্রী যখন বড় পুকুরিয়া কয়লা বা মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তখন এ্যাক্রিডিশন কার্ড হোল্ডার বা বিশেষ সিকিউরিটি পাশধারী ফটোগ্রাফার ভেতরে গিয়ে ছবি তুলছেন, কোন আপত্তি নেই, কিন্তু ঐ প্রকল্প এলাকায় যান আপনি একা কখনো। খনন কাজের ছবি তুলবেন, বাধা দেয়া হবে, রিগ এর ছবি তুলবেন, বাধা দেয়া হবে।

www.pathagar.com

নিরাপত্তার কথা বলে হাজারটা প্রশ্ন। হেড অফিসের পারমিশন লাগবে, বড় কর্তাদের অনুমতিপত্র লাগবে, তার পরেও ছবি তোলা হয় কৌশলে। ধোঁকা দিয়ে। ঢাকার একজন ফটোগ্রাফারের চেয়ে ঢাকার বাইরে কর্মরত একজন ফটোগ্রাফার বেশি ভোগান্তির শিকার হন ছবি তোলার ক্ষেত্রে।

কিছুদিন আগে রাজশাহী বেতার ভবনের ছবি তুলতে গেলে একজন সাংবাদিককে ফটক প্রহরীরা আটক করে ফেলে। ছবি তুলতে মানা। গেটের কাছে তর্কাতর্কির সময় আঞ্চলিক পরিচালক খবর পেয়ে ছুটে আসেন, সে কর্তাটিও ছবি তোলা অপরাধ বিবেচনা করেন। সাংবাদিকের ক্যামেরাটি প্রকাশ্যে ছিল, তিনি ছবিও তুলছিলেন প্রকাশ্যে। কিন্তু একই সাংবাদিক একই বেতার ভবনে গোপনে ক্যামেরা নিয়ে ঢুকে অকেজো যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে অচল ঘড়ির ছবিও তুলে আনেন, তা ছাপাও হয়।

অনেক প্রতিষ্ঠানের সামনে সাইনবোর্ড টাঙানো থাকে। ছবি তোলা নিষেধ। কিন্তু কেন? বলা হয় 'প্রোটেকটেড এরিয়া'। ক্যান্টনমেন্ট প্রোটেকটেড এরিয়া হতে পারে, এয়ারপোর্ট হতে পারে। এলাকার ছবি বিদেশে পাচার হয়ে গেলে রাষ্ট্রের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে সেটা প্রটেকটেড হতে পারে। কিন্তু যদি এলাকাটা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দফতরের 'স্টক ইয়ার্ড' হয়, সেখানে বহু বছর ধরে পড়ে থাকে জং-ধরা কয়েক হাজার হ্যান্ডটিউবওয়েলের পাইপ আর হেড, এবং সামনে লেখা থাকে 'ছবি তুলিবেন না' তাহলে সাংবাদিককে লিখিত এ আদেশ লঙ্ঘন করতেই হয়। তিনি যে কৌশলেই হোক ছবি তোলেন।

আসলে, কিছু কিছু সরকারি-আধাসরকারি সায়ত্বশাসিত দফতর আছে, সেখানে ছবি তোলার নিষেধ সাইনবোর্ডটি ঝোলানো হয় তাদের অবহেলা অনিয়ম অব্যবস্থা দুর্নীতি আড়াল করে রাখবার জন্যে। টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে গেছে কর্তৃপক্ষের কর্তাদের অবহেলার কারণে, কিন্তু সেগুলোর ছবি তোলা যাবে না। 'প্রোটেকটেড এরিয়া' লেখা সাইনবোর্ড বসিয়ে ভেতরে অপকর্মো।

রাজধানীতে যে ফটো সাংবাদিকরা কাজ করেন এদের কারো কারো নিজস্ব কার আছে। দ্রুত চলে যান ঘটনাস্থলে। অধিকাংশেরই আছে মোটর সাইকেল। ধাই ধাই করে ছুটে চলেন, সংগে নেন অন্যপত্রিকার সহকর্মী বা নিজের কাগজের রিপোর্টার। কেউ আবার রিকশাতেও চলেন। ঢাকায় হরতাল হলে, কিংবা বিশেষ ঘটনার দিন (যেমন ধরুন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে) অফিস থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করে দেয়া হয়, ফটোগ্রাফার এককভাবে কিংবা কখনো রিপোর্টার সহকর্মীসহ এলাকা থেকে এলাকায় ছুটে বেড়ান।

যেসব ফটোগ্রাফার জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য, তারা থাকেন লাউঞ্জে কিংবা ক্যাফেটেরিয়ায়, কারো মুখ থেকে কোন ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র ছুটে যান সেখানে। এমনও হয় যে, কোন ঘটনা দুর্ঘটনার খবর এসে পৌঁছালো সরাসরি পত্রিকা অফিসে, কিন্তু অফিসে কোন ফটোগ্রাফার তখন উপস্থিত নেই, আছেন তিনি প্রেসক্লাবে, তক্ষুনি টেলিফোন করা হয় তাকে পেয়ে গেলে জানানো হয় ঘটনা, তিনি তাঁর বাহনে চেপে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। বলাবাহুল্য এগুলোর ব্যাপারে আগে থেকে এ্যাসাইনমেন্ট দেয়া

www.pathagar.com

থাকে না। যেগুলো খাতাপত্রে এ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়, সেগুলো কাভার করতে যান ফটোগ্রাফাররা সরাসরি বাসা থেকে কিংবা পূর্ববর্তী অপর কোন ঘটনাস্থল থেকে, কিংবা ঐ প্রেসক্লাব থেকে।

কিন্তু মুশকিল হয় তাদের যারা এখনো জাতীয় প্রেসক্লাবের মেম্বারশীপ পান নি কিংবা কোন কারণে দেয়া হয় নি। ক্লাব সদস্যদের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত বিধায় নন মেম্বার ফটোগ্রাফার (এবং কিছু রিপোর্টার) ক্লাব ভবনের বাইরের চত্বরে কিংবা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে, বসে থাকেন। এটা এক কষ্টকর ব্যাপার। কোথায় কোন ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে তো থাকে টেনশন তাতে আবার খাবার পানি, চা পান, টয়লেট পর্ব সম্পন্ন করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

'৯৫-এর নভেম্বরে এই পাণ্ডুলিপি তৈরি করার সময় পর্যন্ত নন মেম্বার ফটোগ্রাফার রিপোর্টারদের এ দুর্ভোগ বহাল রয়েছে।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে যাবার সময়, হয়তো আপনার চোখে পড়বে, কিছু তরুণ ক্লাবভবনের বাইরের চত্বরে দাঁড়িয়ে, বসে আছে। কেউ বসে আছে তার মোটর সাইকেলের সিটের ওপর, কেউ বসে আছে বাঁধানো ডিভাইডারের ওপর। এদের অনেকেই বিভিন্ন দৈনিক সাপ্তাহিকের ফটোগ্রাফার-রিপোর্টার, তবে এখনো মেম্বারশীপ পান নি।

ফটোগ্রাফাররা সাধারণত অফিসে ফেরেন সন্ধ্যার পর। ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয় অফিসের দেয়া এসাইনমেন্ট, হয়ে যায় হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা-দুর্ঘটনার ছবি তোলা, বিশেষ প্রতিবেদন বা ফিচারের জন্যে ছবি তোলা, মৌলিক বিষয়ের ওপর ছবি তোলা। অফিসে আছে ডার্করুম, সেখানে ছবি প্রসেস করেন, পরে ছবি প্রিন্ট করেন। কোন কোন পত্রিকার ডার্করুমে আছে সহকারী, তিনি প্রসেস করেন ছবি, ফটোগ্রাফার পরে ছবিটি পছন্দমতো প্রিন্ট করেন। এই ছবি প্রসেস বা প্রিন্ট করা একে সাধারণ ভাষায় বলে 'ছবি বানানো' বা 'ছবি করা'। যেমন : বার্তা বিভাগ থেকে তাড়া দেয়া হলো, করিম, আপনি ছবিটা কি বানিয়েছেন? কিংবা রহিম, আপনি কি ছবিটা করেছেন?

আজকাল, পত্রিকা ভেদে কালার প্রসেসিং প্লান্ট বসেছে। সাদাকালো এবং রঙিন ছবি দুই হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে। কোন ফটোগ্রাফার আছেন, যারা নিজের কাগজের ছবি ছাড়াও বিদেশী নিউজ বা ফটো এজেন্সিতে ছবি পাঠান, তারা কেউ নিজেদের পত্রিকা অফিসে কিংবা কেউ এজেন্সির ঢাকা অফিসে ছবি প্রসেস করেন।

ফটোগ্রাফাররা একের অধিক হলে, নিজ নিজ তোলা ছবি প্রিন্ট করে আনেন এবং ক্যাপশন ছবির বিবরণ (নিচে যা লেখা থাকে) লিখে দেন। অনেক সময়, ফটোগ্রাফার ছবির বিবরণ বলেন, কোন সহকর্মী লিখে দেন তা, কিংবা কোন পত্রিকায় শীফট ইনচার্জ, চীফ সাব এডিটর কিংবা কখনো বার্তা সম্পাদক নিজে লেখেন। অবস্থাভেদে ক্যাপশন সম্পাদনা করেন। এরপর ছবি চলে যায় ক্যামেরা সেকশনে, যেখানে পজেটিভ তৈরি হয়, আর পূর্ব লিখিত ঐ ক্যাপশন চলে যায় কম্পোজ বিভাগে। প্রসেসিং-এ দেবার আগে ছবিটি কোন পাতায় যাবে, ছবির মাপ কতো কলাম ইঞ্চি হবে, মাপজোক করার পর ছবির পেছনে তা মার্ক করেন। সেই অনুসারে পজেটিভ তৈরি হয়। ক্যাপশনের কম্পোজও ততো কলাম দীর্ঘ হয়।

www.pathagar.com

এই যে কাজ, ফটোগ্রাফারের ছবি প্রসেসিং, প্রিন্ট এবং ক্যাপশন লিখে দেয়া, তারপর কোন ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর পেলে, বার্তা সম্পাদক যদি মনে করেন যে ঐ বিষয়ের ছবি গুরুত্বপূর্ণ এবং আগামীকালের পত্রিকায় ছাপানোর মতো, তাহলে আবারো কোন ফটোগ্রাফারকে পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে। যেমন ধরুন, রাত ১১টা বেজে গেছে, ছবি প্রসেসিং-এর কাজ শেষ, ফটোগ্রাফারের ডিউটি শেষ নয়, হয়তোবা খবর মিললো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছে কোন এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১০ ব্যক্তির লাশ। এ ছবি গুরুত্বপূর্ণ, আগামীকালের কাগজে দিতে না পারলে বাসি হয়ে যাবে, অন্য কোন পত্রিকা নিশ্চয়ই কাভার করবে ছবিটি, সেক্ষেত্রে ফটোগ্রাফারকে ছুটতে হয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

এমনও কিছু সময় থাকে যখন বার্তা সম্পাদক চান শেষ মুহূর্তের ছবিটি আগামীকালের পত্রিকায় ছাপতে, তখন ফটোগ্রাফারকে বাড়তি সময় অপেক্ষা করতে হয়। যেমন : সিদ্ধান্ত হলো, একুশে ফেব্রুয়ারি রাত বারোটা এক মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের দৃশ্যটি পত্রিকায় ছাপা হবে। সেক্ষেত্রে ফটোগ্রাফারকে ঐ সময় ঘটনাস্থলে (কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে) থাকতে হয়। ঠিক বারোটা এক মিনিটে ছবিটি তুলে আনেন তিনি, অফিসে ফিরে ছবি প্রসেস ও প্রিন্ট করতে হয়। এ ধরনের বিশেষ দিবস বা ঘটনার ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফার কাজ করেন খুব দ্রুততার সাথে, এক মিনিট এদিক ওদিক হবার জো নেই। এমন এসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফারের সাথে একজন রিপোর্টারকেও কাজ করতে হয়। রিপোর্টার শহীদ মিনারে রাত বারোটা এক মিনিটে যা ঘটলো তার বিবরণ সংগ্রহ করেন ঘটনাস্থলে থেকে এবং অফিসে ফিরে তা লিখে দেন। কয়েক ঘন্টা পর এই রিপোর্টের বিবরণ আর ঐ ছবি পাঠকের সামনে হাজির হয়।

জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন, বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা, ঢাকা মহানগরীর কোথাও গভীর রাতে বয়ে যাওয়া ঝড়ঝঞ্ঝা, বড় ধরনের দুর্ঘটনা, রাজনৈতিক কোন ঘটনা, এ ধরনের ব্যাপার-বিষয় হলে ফটোগ্রাফার-রিপোর্টার উভয়কেই অনেক রাত পর্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকতে হয়।

অনেকক্ষেত্রে, আগে থেকেই যদি বোঝা যায় যে, ঘটনাটি অনেক রাতে ঘটবে, সেক্ষেত্রে অধিকাংশ জাতীয় দৈনিকে শহর সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ, ঢাকার বাইরে যে পত্রিকাগুলো বিক্রির জন্যে যায়, সেগুলোর (প্রথম পৃষ্ঠা) ছাপা হয় একরকম আর মহানগরী ও আশেপাশের এলাকায় সরবরাহকৃত পত্রিকা বের হয় অন্যরকম। তবে, শহর সংস্করণ বের করলে প্রথম পৃষ্ঠার সব নয়, কোন কোন খবর বা ছবির ডিসপ্লেতে পরিবর্তন আসে। যেমন ধরুন : বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা হচ্ছে। একটি খেলা শেষ হলো রাত একটায়। সে খবর (সম্পূর্ণ বা আংশিক) আর ছবি ছাপানো হলো ঢাকার বাইরে পাঠানো হবে পত্রিকার এমন কপিগুলোতে। আর, দ্বিতীয় খেলাটি, সেটি যদি রাত সাড়ে ৩টায় শেষ হয়, তাহলে তার খবর আর ছবি ছাপা হবে নগর সংস্করণে। এ সংস্করণ একটু দেরি করে ছাপা হলে ক্ষতি নেই, ভোরবেলা ৫/৬টায় ছাপা হয়ে বেরুলেও চলে, কেননা তা তো বিক্রি হবে ঢাকা মহানগরীতে, কোন জায়গার মেইল ফেল করার প্রশ্ন নেই।

www.pathagar.com

এই যে দুবার করে কপি ছাপানো, সেজন্যে বার্তা বিভাগ, কম্পোজ বিভাগ, ছবি প্রসেসিং বিভাগ, প্লেট মেকার, প্রেস, সবাইকে নিজ নিজ পর্যায় থেকে কাজ করে যেতে হয়। ফুটবল খেলার ছবি, যদি সরাসরি বিদেশী এজেন্সীর কাছ থেকে পাওয়া না যায়, ছবি যদি তুলতে হয়, ফটোগ্রাফারকে, টিভির পর্দা থেকে, তাহলে ফটোগ্রাফারকে ডিউটি করে যেতে হয়। আসলে, একজন ফটোগ্রাফার কখন কাজ করবে, কতোক্ষণ কাজ করবে, সেটি নির্ভর করবে ঘটনা কি রকম ঘটবে বা কখন ঘটবে, তার ওপর। এমনও হয় যে, কোথাও তেমন কোন ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটলো না, তাৎক্ষণিক গুরুত্ব বহন করে এমন ছবির ঘাটতি, তখন কোন মৌলিক বিষয়ের ওপর ছবি ছাপানো হয়ে থাকে প্রথম পাতায়। ছাপানো হয় জনসমস্যা সম্পর্কিত ছবি। এগুলোর কোনটা আগে থেকে তোলা থাকে, কোনটা আবার ঐদিনই এসাইনমেন্ট দিয়ে তুলিয়ে আনা হয়।

সব কাগজেই ফটোগ্রাফারের কাছে ছবির ফাইল থাকে, ছবি মজুদ থাকে বার্তা সম্পাদকের টেবিলেও। ছবির ঘাটতি থাকলে সেগুলো ব্যবহার করা হয় প্রথম পাতায়। খবর যেমন, তেমনি অনেক বিষয়ের ওপর ছবি থাকে যার দীর্ঘমেয়াদী প্রকাশ গুরুত্ব থাকে, সহজ কথায় এগুলো পচে যায় না। ঢাকায় একটা সড়ক দুর্ঘটনা ঘটলো যাতে নিহত হলো ৬ জন, এদের লাশের ছবি কিংবা দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া বাস-টেম্পোর ছবি ঘটনার পরদিন না ছাপলে তার আর প্রকাশ গুরুত্ব থাকে না। পাঠকও চাইবেন না শনিবারের দুর্ঘটনার ছবি মঙ্গলবারে দেখতে। সে কারণে ঐ ছবি পরদিনই ছাপা হয়ে যায়। রাষ্ট্রপ্রধানের কোন এলাকা পরিদর্শন বা সভাসমাবেশে ভাষণ, নেতানেত্রীর জনসভার বক্তৃতা, মিছিল, ঢাকার রাস্তায় চালের মূল্য কমানোর দাবিতে মহিলাদের হাঁড়ি মিছিল, কাগজের দাম কমানোর দাবিতে মানপাতা হাতে ছাত্রছাত্রীদের মিছিল, জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ, অগ্নিকাণ্ডে বস্তি পুড়ে ছাই, হরতাল পালনের সময় ফাঁকা সড়ক এই ধরনের শতেক ঘটনা-বিষয় আছে, যেগুলোর তাৎক্ষণিক প্রকাশ গুরুত্ব রয়েছে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা পেরুলে এগুলো (ঐ সময়ের জন্যে) বাসি হয়ে যায়।

কিন্তু, এমন হয় যে, ফটোগ্রাফার ১ মাস আগে তুলে রেখেছেন ঢাকার সড়কের ছবি যার দু'পাশে সারিবদ্ধ শুয়ে আছে গ্রাম থেকে আসা ছিন্নমূল বহু পরিবার, কিংবা কোন সড়ক ভেঙ্গেচুরে গেছে, ম্যানহোলের ঢাকনা খোলা, ঢাকার রাস্তায় ভীষণ যানজট, মাছের বাজারে সাজানো আছে প্রচুর মাছ, এ ধরনের ছবি ছাপা হয়ে যায়, তবে, ছবিটি নিজস্ব মজুদ থেকে বের করে দেয়ার সময় ফটোগ্রাফার লক্ষ্য রাখেন ঐ বিষয়ের ছবির বিষয়বস্তু বা ঘটনাস্থলের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

ফটোগ্রাফার তুলে রেখেছেন রামপুরার রাস্তা খোড়া হয়েছে ওয়াসার পাইপ লাইন সংস্কারের জন্যে এবং সেখানে ঐ সড়কের ভীষণ যানজট হচ্ছে। ছবিটি তুলেছেন দিন পনেরো আগে, এতো দিনে সেটি (অন্য ছবির রাশ থাকায় বা অন্য কোন কারণে) বার্তা সম্পাদনা টেবিলে দেন নি, এখন দিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে তিনি একবার যাচাই করে নেন যে রামপুরার ঐ সড়কটিতে খোড়া ড্রেন ইতোমধ্যে ভরাট হয়ে গেছে কিনা। নইলে, ছবিটি প্রকাশিত হলে, কিছু পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।

ফটোগ্রাফারের কাছে যেমন, তেমনি বার্তা সম্পাদকের কাছেও কিছু ছবি মজুদ থাকে। ছবির ঘাটতি দেখা দিলে সেখান থেকে ছবি বের করে, যেটি বিষয় সময়-মিল বলে মনে করেন ব্যবহার করেন।

www.pathagar.com

ধরুন, একটি ছবি ফটোগ্রাফার তুলে এনে দিয়েছেন চার-পাঁচদিন আগে, ছবির বিষয় হলো ফুটেছে একজোড়া কদমফুল, সেটি বার্তা সম্পাদক আগেই হাতে পেলেও ছাপবেন আষাঢ়ের ঠিক প্রথম দিবসে। এটা প্রচলিত যে ধারা, তাতে ঐদিনে ছাপানোর মতোই ছবি।

একইভাবে মে দিবসের কাগজে ছবি দেখলেন একজন শ্রমিক শাবল গাঁইতি চালাচ্ছে সেটিও এমন হয়েছে যে আগে তুলে রেখেছেন ফটোগ্রাফার। এবং সেটা এপ্রিলের তিরিশ তারিখে নয়, কিংবা মে মাসের দোসরা তারিখে নয়, ঐ পহেলা মে'তেই ছাপা হবে।

অনেক ছবি থাকে, সেগুলোর তোলার দিন বা সময় কোন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না, মুখ্য হয়ে ওঠে বিষয়টি।

'৯৫-এর প্রথম দিনে অর্থাৎ পয়লা জানুয়ারি ছাপা হলো একটি ছবি, যাতে দেখছেন নদীর ধারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, প্রায়-অন্ধকার পরিবেশ, ছবির নিচে লেখা আছে স্বাগত নতুন বছর। এই ছবিটি প্রকৃতপক্ষেই আগের দিনের তোলা হতে পারে, আবার অনেক আগেরও তোলা হতে পারে।

তবে, '৯৫-এর পয়লা জানুয়ারির পত্রিকায় যদি প্রকাশিত ঐ ছবির ক্যাপশনে লেখা হয় 'নতুন বছরের নতুন সূর্য' তাহলে স্বাভাবিকভাবেই . . .।

সংবাদপত্র একটি টীম ওয়ার্কের ফসল সেকথা আগেই বলেছি। আলোচ্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অন্যান্যরা, নেপথ্যে যারা কাজ করেন তারাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিদিন পাঠকের হাতে পৌঁছে একটি তাজা খবরের কাগজ।

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে সংবাদপত্রের সাংবাদিক, কলামিস্ট, কর্মী এরা অন্য সবার কথা লিখলেও নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, অভাব অভিযোগের কথা কাগজের পাতায় ব্যক্ত করার সুযোগ কখনো পান না। এমনকি মৃত্যুর পরও অনেক কর্মীর ছবি বা মৃত্যুসংবাদটি ঠিকমত ছাপা হয় না। এখানেই কাগজের মানুষজনদের ট্রাজেডি।

এমন অনেক সংবাদপত্র কর্মী রয়েছেন যিনি সারাজীবন সংবাদপত্রের জন্য নিবেদিত ছিলেন কিন্তু শেষ বয়সে চিকিৎসার টাকা যোগার করতে না পেরে ধুকে ধুকে মরেছেন। পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে এর ওর কাছে হাত পেতেছেন। এদের জন্যে ভাববার সময় কি কারো নেই?

---

www.pathagar.com